F O C U S

-WHERE THE GENERATIONS CONVERGE

DEPARTMENT OF PHYSICS, CITY COLLEGE
102/1, Raja Rammohan Sarani, Kolkata, West Bengal 700009

20 22

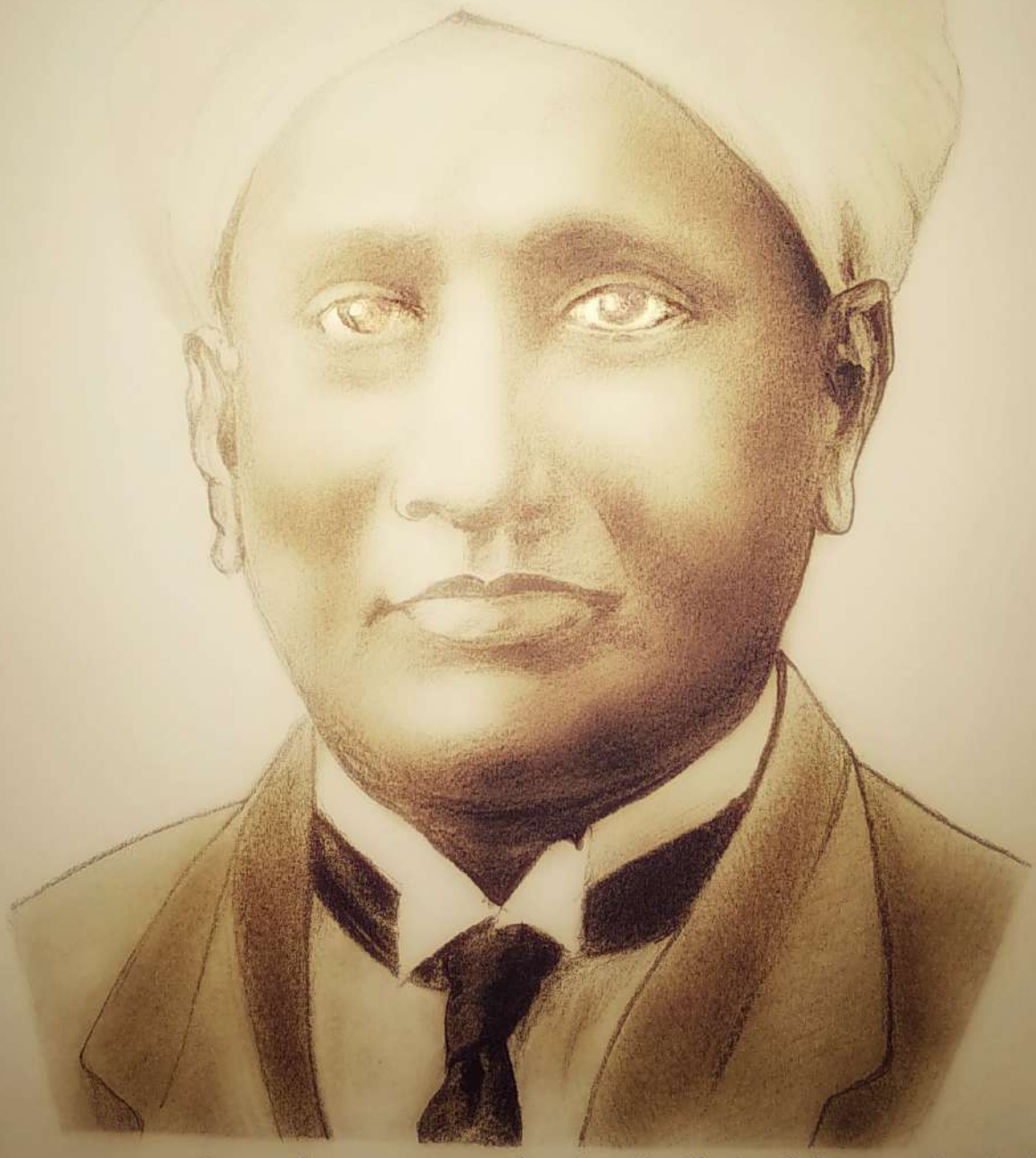

" Success can come to you by courageous devotion to the task lying in front of you."

-CHANDRASEKHARA VENKATA RAMAN

FOCUS

-Where the generations converge

2022

Department of Physics
City College

102/1 Raja Rammohan Sarani, Kolkata – 700009

"Success can come to you by courageous devotion to the task lying in front of you"

- Chandrasekhara Venkata Raman

প্রকাশ : মে, 2022

সংখ্যা : চতুর্থ

সম্পাদক : ডঃ সমাপ্তি পাল,
অধ্যাপিকা

প্রচ্ছদ : অর্চিষ্মান সরকার,
প্রাক্তন ছাত্র

প্রকাশনা : পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ,
সিটি কলেজ,
১০২/১, রাজা রামমোহন সরণী,
কলকাতা – ৭০০০০৯

মুদ্রণ : ইনডোর আউটডোর ক্রিয়েটিভ এজেন্সি,
৯/১এ চিন্তামণি দাস লেন,
কলকাতা – ৭০০০০৯

CITY COLLEGE

Affiliated to the University of Calcutta
102/1, Raja Rammohan Sarani, Kolkata – 700009
Phone : 033 2350 1565, Office : 033 2360 7463
E-mail : principal.citycollege@gmail.com
Website : www.citycollegekolkata.org
GST No. : 19CALC00619D1DE

Ref. No. : ..... Date : .....

শুভেচ্ছাবার্তা

সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত বাৎসরিক পত্রিকা "Focus - where the generations converge" - এর এটি চতুর্থ প্রকাশ, সেই উপলক্ষে প্রথমেই বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান সকল ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও অশিক্ষক-কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের অক্লান্ত প্রয়াস এই পত্রিকাটি। এই কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বিভাগ যা 1939 সালে পাস কোর্স নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে অনার্স কোর্স শুরু হয় 1947 সাল থেকে। শুরু থেকে বহু স্বনামধন্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমান সমাজে ছাত্র-ছাত্রীরা যুগের গতির সাথে তাল রাখতে একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে হারিয়ে ফেলছে তাদের সুকুমার চিন্তাধারা ও প্রবৃত্তিগুলিকে। এই পত্রিকা তাদের মানসিকতা, চিন্তাধারা, সৃষ্টিশীলতা প্রতিফলনের এক অনন্য দর্পণ। তাই আবারও পদার্থবিদ্যা বিভাগের এই পত্রিকা প্রকাশনার আয়োজনকে ধন্যবাদ জানাই। এই বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের মিলিত প্রয়াসে এই পত্রিকা প্রকাশনার আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই। আশা রাখি প্রতিবছর আরো সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হোক এই পত্রিকা। সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

Sital prasad Chattopadhyay

(ডঃ শীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) 23.04.2022

অধ্যক্ষ, সিটি কলেজ, কলকাতা- ৯

Principal
CITY COLLEGE
Kol-9

বিভাগীয় প্রধানের শুভেচ্ছাবার্তা

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 'FOCUS - where the generations converge' এর প্রকাশন চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করতে চলেছে। এর আগে যে তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে, তার জন্য বিভাগের সমস্ত কার্য্যকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। একইসাথে পূর্বতন ও বর্তমান লেখকদের ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অবশ্যই প্রকাশনের সম্পাদক ডঃ সমাপ্তি পাল -এর অধ্যবসায় ও কর্ম নৈপুণ্য প্রশংসার দাবি রাখে।

সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগ দীর্ঘদিন থেকে সাফল্যের সুনাম অর্জন করে চলেছে। এর পিছনে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের স্মরণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান অধ্যাপকরাও পুরানো ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। বোঝা যায় - পদার্থবিদ্যার চিরাচরিত পঠন-পাঠনের বাইরে গিয়ে কিছু সৃষ্টিশীল কাজে লিপ্ত হওয়ার বাসনা থেকে এই প্রকাশন জন্ম নিয়েছে। বিগত প্রকাশন গুলি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটি প্রকাশন বহুমাত্রিক। একদিকে যেমন সাহিত্যচর্চার নিদর্শন মেলে, তেমনই বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার সমাহার পরিলক্ষিত হয়। এখানে কনিষ্ঠতম ছাত্র থেকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের লেখনীর প্রকাশ বিদ্যমান। লেখনীর প্রসার এবং লেখককূলের ব্যপ্তি প্রমাণ করে এই প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তা । তাছাড়া সুপ্ত সৃজনশীলতা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এই প্রকাশন গণ্য করা যেতে পারে। ভাবী বিজ্ঞানীদের জন্য এই প্রকাশনটি প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে । সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এই প্রয়াস প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে । সমস্ত লেখনীর গুণগত মান উল্লেখযোগ্য এবং প্রকাশনের পেশাদারিত্ব প্রশংসার দাবি রাখে।

পরিশেষে পদার্থবিদ্যা বিভাগের সমস্ত ছাত্রকূল, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং অধ্যাপকগণের প্রতি আমার সবিনয় আবেদন, আপনারা সকলে মিলে এই চতুর্থ প্রকাশনকে সাফল্যমন্ডিত ও সার্থক করে তুলুন। এই প্রয়াসে সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আশা রাখি, এই উদ্যম ও প্রেরণা অব্যাহত থাকবে এবং এই প্রকাশন চিরস্থায়ী হবে ।

মিতা মন্ডল

(ডঃ মিতা মন্ডল)

বিভাগীয় প্রধান,পদার্থবিদ্যা বিভাগ

সিটি কলেজ , কলকাতা ৭০০০০৯

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানের শুভেচ্ছাবার্তা

বিভাগীয় পত্রিকা ফোকাস সগৌরবে নতুন কলেবরে তার চতুর্থ বর্ষে পদার্পন করল। পত্রিকার সম্পাদিকাকে ধন্যবাদ জানাই তার নিরলস পরিশ্রম এবং নিপুন সম্পাদনার জন্য। পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বিভাগ এবং বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ এবং প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছেন তিনি। ক্রমে ক্রমে পত্রিকার আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক এই কামনা করি।

মিতালী মিদ্দ্যা

(ডঃ মিতালী মিদ্দ্যা)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, সিটি কলেজ
কলকাতা -৭০০০০৯

নিবেদন

সিটি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বাৎসরিক পত্রিকা 'Focus- where the generations converge' এর চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হল। বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন ধরনের লেখা, আঁকা আর ফটোগ্রাফীতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আমাদের এই পত্রিকা। পত্রিকার প্রচ্ছদের সুন্দর ছবিটিও বিভাগের এক ছাত্রের আঁকা। ছাত্র-ছাত্রীরা অধীর আগ্রহে এর প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছিল। কারণ বিগত দু'বছর অনিবার্য কারণে পত্রিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। 2020 সালের মার্চ মাসে পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে বিশ্বজুড়ে এক অজানা রোগের আবির্ভাবে 'লকডাউন' ঘোষণা হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকার প্রকাশ। শুধু আমাদের পত্রিকা নয়, 'লকডাউন' সারা পৃথিবীকেই স্তব্ধ করে দেয়। আমরা সম্মুখীন হই এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির। অজানা রোগ যার নাম দেওয়া হয় কোভিড, ক্রমশ অতিমারীর আকার ধারণ করে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে নেয়। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হতে থাকে- অনেক প্রাণহানি হয়। গৃহবন্দী হয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি বিশ্বজুড়ে এই অতিমারীর দাপট। অতিমারীর প্রকোপে মানুষের বেঁচে থাকা, সুস্থ থাকাটাই যখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন পত্রিকা প্রকাশের প্রশ্নটি স্বভাবতই পিছনের সারিতে চলে যায়।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ যখন অসহায় বোধ করছিল, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছিল, তখন বিজ্ঞানীরা কিন্তু হাল ছাড়েননি। আবিষ্কার করেছেন এই অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার হাতিয়ার - 'ভ্যাকসিন'। বিজ্ঞানের কল্যাণে আর বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন আমাদের আশার আলো দেখিয়েছে। অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। যার ফলে আজ একটু একটু করে আবার আমরা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে চেষ্টা করছি। ঘরবন্দী ক্লান্ত মন আবার বাইরের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। এতদিনের বন্ধ থাকা স্কুল কলেজের দরজা আবার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। তাই তাদের মনের জানালা খুলে দিতে প্রকাশিত হল তাদের প্রিয় পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা। দু'বছর আগের সম্পূর্ণ করে রাখা পত্রিকাটি কোনরকম সংযোজন ছাড়াই প্রকাশ করা হল। শুধু পরিবর্তন হলো ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়। কারণ, সে দিনের দ্বিতীয় সেমিস্টার আজকের ষষ্ঠ সেমিস্টার আর সেদিনের চতুর্থ সেমিস্টার আজ প্রাক্তন।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান সকল সদস্যের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও যৌথ প্রয়াসে সৃষ্ট এই পত্রিকা। আশা রাখি পত্রিকার এই সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে। পত্রিকা প্রকাশে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সব রকম সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে এই পত্রিকাকে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা আর শুভকামনা প্রার্থনা করি -

ডঃ সমাপ্তি পাল, সম্পাদক

সূচীপত্র

1. শুভেচ্ছাবার্তা.....i
2. বিভাগীয় প্রধানের শুভেচ্ছাবার্তা.....ii
3. প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানের শুভেচ্ছাবার্তা.....iii
4. নিবেদন.....iv
5. Remembrance.....1
6. স্মৃতি বড় বেদনার (প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী) 2
7. Painting (Archishman Sarkar).....3
8. Thoughts of a growing Physicist (Shramana Paul) 4
9. ভালো বন্ধু হতে পারি না! (শুভদীপ কাজলী) 5
10. মহাকাশ-অভিযানের এক টুকরো রহস্য (অয়ন্তিকা পাল).....6
11. Painting (Pratap Baj).....8
12. বাঙালিয়ানা (শুভদীপ দে) 9
13. ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী শিক্ষাবর্ষ (অরিত্র গুপ্ত).....10
14. প্রতিশোধ (সায়ক ঘোষ).....;.....11
15. Painting (Debjit Maji) 14
16. পলায়ন (দুর্লভ দত্ত).....15
17. ভীতু (ডঃ দিব্যেন্দু নন্দ).....18
18. যুবসমাজের প্রতি (অচেনা কবি).....19
19. এটাই শেষবার (ইরফান হাবিব)... 20
20. সিকিমযাত্রীর ডায়েরী: রডোডেনড্রন ট্রেক ও অন্যান্য (ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জী) 22
21. Dark Matter: Why does it matter? (Dr. Dibyendu Nanda).....32
22. Photograph (Sayak Ghosh).....34
23. Universal Responsibility (Bipul Mandal).....35
24. লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ও নোবেল পুরস্কারের গল্প (ডঃ অংশুমান নন্দী).....36

25. আমাদেরই বেলতলা যে, ন্যাড়া সেথা খেলতে আসে। (ডঃ অমিতাভ পাল) 38
26. Gravity in Quantum Mechanics and Gravity-induced quantum interference (Dr. Amiya Bhushan Biswas) 46
27. Painting (Srabani Das).....51
28. Physics, spherical balls and the games people play (Dr. Bhupati Chakrabarti) 52
29. রামমোহন রায় হোস্টেল (অচ্যুত কুমার চক্রবর্তী) 54
30. বিশ্বাসের জন্ম-মৃত্যু (তরুণ কুমার তপাদার) 64
31. Department of Physics 67

Remembrance

Prafulla Kumar De joined the department of Physics of City College as a 'Demonstrator' in the year 1950. Subsequently he became lecturer in Physics and was in teaching for more than 41 years. He retired from this Institution on September 1990.

In 2017, when the first reunion of the Department of Physics was planned, we invited him to join us in the programme. We also requested him to contribute an article in the first departmental magazine, - "Focus - where the generations converge", sharing his golden memories associated with the college.

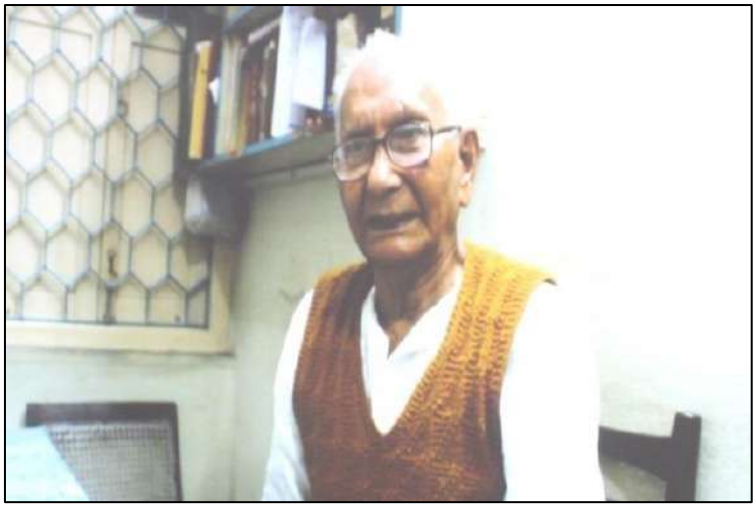

At the age of 92 years, it was not possible for him to join the reunion programme travelling through a long distance from his residence at Chandannagar. But he was happy to accept our invitation and contributed a nice article, -"Walking down the memory lane"- in the first issue of the magazine. An audio-visual message for the department from him was arranged in the reunion ceremony. All of the members present in the function enjoyed the beautiful speech and were blessed with his good wishes. His feelings in his own words- "--------- Till today, even though many years have passed since my retirement, your wish to have my participation and presence in any of the functions of our college, delights me and provides a sense of peace in my mind, that I could really receive such a recognition from you, in such a touching manner. My sincere thanks to all of you and best wishes for your future". We all were very happy to receive such a nice response from him and will remain grateful for his spontaneous participation and cooperation, overcoming the barrier of age.

Unfortunately, we will never get another opportunity to interact with him in future. Following the laws of the Universe - which everybody has to accept - he left us forever on 21st April, 2019. We believe, he is, and will remain with us, in our memories, forever.

স্মৃতি বড় বেদনার

- প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষাকর্মী

আমি একজনকে চিনতাম, যে সৎ কর্মঠ ও কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান। আমাদের সেই কর্মচারী 2003 সালে ক্যাজুয়াল কর্মী হিসাবে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কাজে যোগ দেয়। 10 জন ক্যাজুয়াল কর্মী বিভিন্ন বিভাগে কাজে যোগ দেয় তার মধ্যে তিনজন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে, গোপাল তার মধ্যে অন্যতম। আমি যখন লাইব্রেরী থেকে 2009 সালে ট্রান্সফার হয়ে অফিসের লিভ সেকশনে আসি তখন লিভের কাজ কর্মের সুবাদে গোপালের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। আজ গোপালের কিছু স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ও আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। 2019 এর জুন মাসে দুঃখের সাথে ওকে আমরা হারিয়েছি। আমরা বলতে টিচিং, নন টিচিং ও ছাত্র ছাত্রীরা। 2015 সালে আমি লিভ সেকশন থেকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ট্রান্সফার হয়ে আসি। কাজের সূত্রে ওকে আরো কাছ থেকে দেখেছি, ও অমায়িক ছেলে ছিল। কোন কাজই ওর কাছে কাজ বলে মনে হতো না। 2015 সালে ট্রান্সফার হয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে এসে আমরা, আমি ও উচিত বাবু কোন কাজ জানতাম না। উচিত বাবু আমার সঙ্গে একই দিনে প্রিন্সিপাল রুম থেকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে বদলি হয়ে আসে। কিন্তু গোপাল ধরতে গেলে ফিজিক্স ল্যাবরেটরির পুরো দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছিল। এইভাবে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রী ও আমাদের কাছে নয়নের মনি হয়ে উঠেছিল। শুধু পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ নয়, পুরো কলেজে সবার কাছে ও অত্যন্ত প্রিয় ছিল ওর চরিত্রের গুণে। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের পুনর্মিলন বা সেমিনারে ওকে সমস্ত ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে, আর পিকনিকে ওর ইনভলভমেন্ট চোখে পড়ার মতো। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারী আমরা ধরেই নিতাম গোপাল মানেই এই পিকনিক পূর্ণতা পাবে। 2017 সালে ওকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথমে অফিসে ও মাস ছয়েক পর কলেজগেটে বদলি করা হয়, তারপর থেকে ও কলেজগেটে ডিউটি করত। 2019 সালের এপ্রিল মাস থেকে ওকে গেটে মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখতাম। জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে ও কিছু বলতে চাইত না, পরে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ওকে ডেকে মনমরা হয়ে থাকার কারণ জানতে চাইলে ও আমাকে বেশ কিছু পারিবারিক কারণ বলেছিল। এই কারণগুলি হয়তো ওকে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে, সেখান থেকে ও আর কোনদিন ফিরে আসবেনা। গোপালের কথা লিখতে গিয়ে মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। আজ ও যেখানেই থাকুক ভালো ও চির শান্তিতে থাকুক এই কামনা করি।

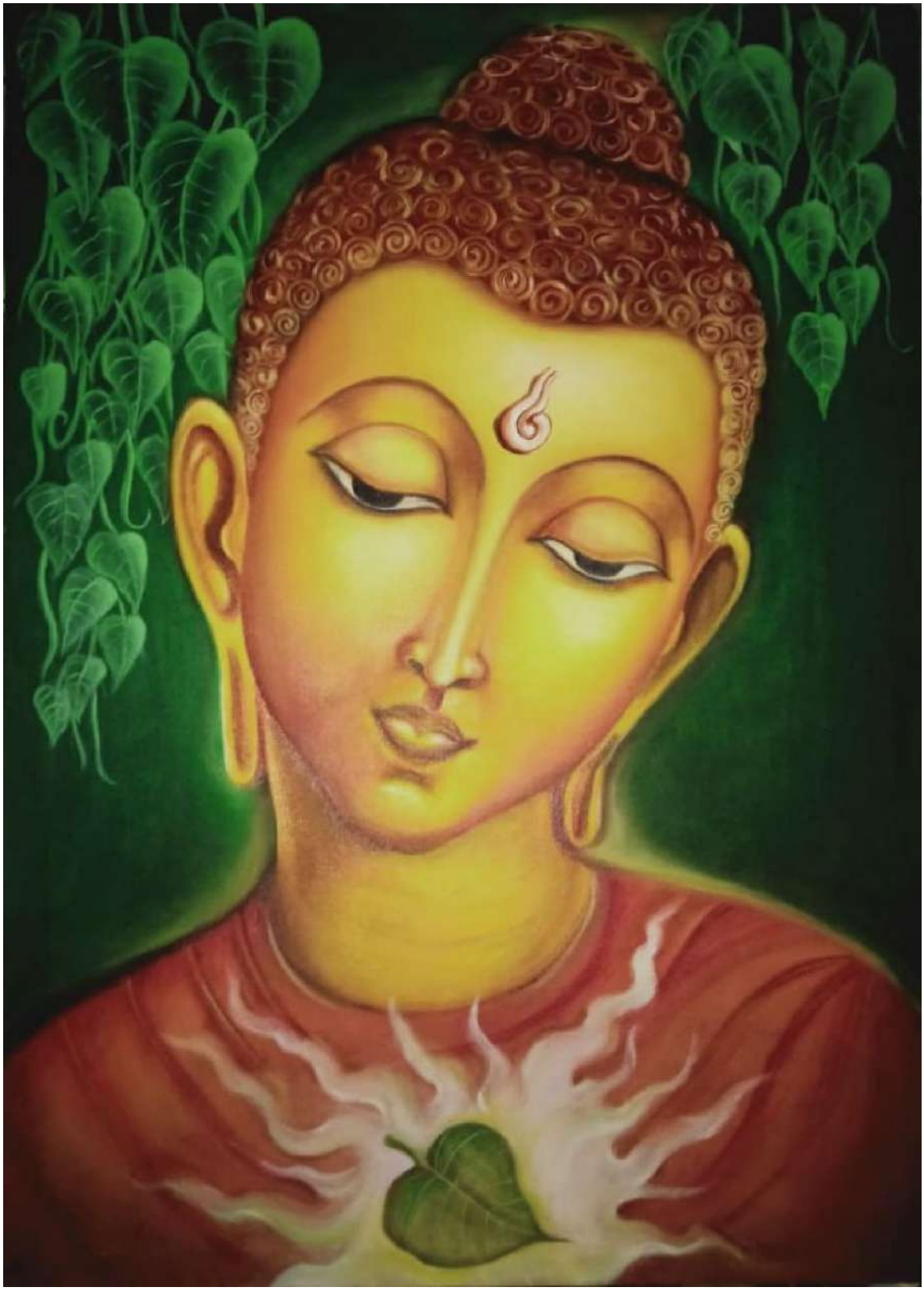

- Archishman Sarkar, Ex Student.

Thoughts of a growing Physicist

- Shramana Paul, Sixth Semester

Allow me to submerge myself
in this holy world of knowledge and intelligence.
The earth is not for me,
As I have my own planet to live.

Who would like to do conspiracy and hatred!
With someone like me who don't bother and is straight.
Torque, equation, force and polar coordinates,
You are now my best friend and will be always.

Don't think I am mad just take me as a native to black hole
Who want to stay submerged in that intense gravity with its goal.
I am not self-sufficient probably,
As I sometimes need a planet or star's gravity immensely.

To change the direction of my thoughts and way
As I'm travelling in the vast space and far away.
One day I will find an astounding astronomical body
For that day a warning to the world, "get ready".

ভালো বন্ধু হতে পারি না!

- শুভদীপ কাজলী, প্রাক্তন ছাত্র

সম্পর্ক গুলো ক্রমে ক্রমে, ভাঙতে থাকে বেশ,
তবুও মোদের বাঁচতে হয়, নিয়ে খুশির রেশ।

বদ্ধ ঘরে নিশ্চুপ হয়ে, যতই ভাবো অন্যের কথা!
তারা কী ভাবছে তোমায়, বুঝেছে তোমার মনের ব্যাথা?

যাদের কাছে আশা রাখো, ভরসা রাখো মনে,
তারাও তোমায় পর ভাবে, ভেবেছ কী আনমনে!

অনেক বন্ধু পেয়েছি আমি, করেছি অনেক বন্ধুত্ব,
হয়তো ভালো বন্ধু নই, তাই, নেইকো ভালো মুহূর্ত।

যাদের ভাবি কাছের করে, রাখবো যোগাযোগ!
তারাও আজ ফিরিয়েছে মুখ, হয়েছে অমনোযোগ।

নিজের কষ্টে, নিজেই হাসি, খুশিতে আবার কাঁদি বেশি,
তবুও নিজের চাওয়াকে আমি, বড্ড বেশি ভালোবাসি।

নিজের চোখে মেলেনা চোখ, নিজেকেই বুঝি না!
সত্যিই আমি, নিজের, ভালো বন্ধু হতে পারি না!

মহাকাশ-অভিযানের এক টুকরো রহস্য

- অয়ন্তিকা পাল, ষষ্ঠ সেমিস্টার

জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়তই সৌরজগতের গ্রহগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, কৃত্রিম উপগ্রহগুলি থেকে পাঠানো ছবির উপর নির্ভর করে। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে দুটি গ্রহ, বুধ ও শুক্র। গণিতের একটা মজার নিয়ম মেনে শুক্রকে সূর্যের আলোকিত চাকতির পটভূমিতে কখনও ছোটো একটা টিপের মতো ধীরে ধীরে সরে যেতে দেখা যায়। জ্যোর্তিবিজ্ঞানের ভাষায় এই ঘটনা হল 'ট্রনজিট অফ ভেনাস'। বাংলায় একে বলে 'শুক্রের সূর্যসরণ'। পাটীগণিতের অদ্ভূত নিয়ম মেনে পর্যায়ক্রমে ঘটতে থাকে এই বিরল মহাজাগতিক ঘটনা। কখনও হয়তো ৮ বছরের ব্যবধানে পরপর দুবার, তারপর ১০৫.৫ বছর বা ১২১.৫ বছরের দীঘ ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি ঘটে এই বিরল মহাজাগতিক ঘটনার। চলতি শতাব্দীতে দুবার হয়েছে এই ঘটনা। ২০০৪ সালে ৮ই জুন তারপর প্রায় ৮ বছর পর ২০১২ সালের ৬ই জুন। এমন ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি দেখতে গেলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ২১১৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই মহাজাগতিক ঘটনার শর্ত হল সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে একই তলে ও একই সরলরেখায় আসতে হবে শুক্রকে। পৃথিবী থেকে 'বুধের সরণ' প্রত্যক্ষ করা যায়। যদিও বা শুক্রের সরণের থেকে বুধের সরণ তুলনামূলকভাবে একটু বেশিই ঘটে। শেষ দেখা গিয়েছিল এই মহাজাগতিক ঘটনাটি ২০১৬ সালের ৯ই মে।

বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল 'লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার' বা 'এলএইচসি'। প্রাথমিকভাবে এই যন্ত্রে উচ্চশক্তির প্রোটনকণার স্রোত বা 'বিম' ইনজেক্ট করা হবে এবং ক্রমশ গতিবেগ বাড়ানো হবে। শেষে আলোর গতিতে সেই প্রোটনকণা-গুলির সংঘর্ষ ঘটিয়ে এই যন্ত্রে 'হায়ার এনার্জি ডেটা' উৎপন্ন করা সম্ভব বলে জানিয়েছিলেন প্রস্তুতকারক সংস্থার বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার ফলে নানা অজানা তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। ১৬৬৬ সালে ডাচ পদার্থবিজ্ঞানী হাইগেনস প্রথম বুঝতে পারেন যে একটি বিশাল বলয় শনিকে ঘিরে রয়েছে। শনির বলয়ের ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফিতে দেখা গিয়েছে যে, শনিগ্রহকে কেন্দ্র করে বর্তমানে অসংখ্য বলয়সহ উপগ্রহের অবস্থান রয়েছে। শনির একটি ক্ষুদ্র এবং বেশ দূরবর্তী উপগ্রহের বলয়টিই সৌরজগতের উপগ্রহ বলয়গুলির মধ্যে বৃহত্তম। এই উপগ্রহের নাম 'ফিয়োরে'। শনির মতো এত সুন্দর বলয় সৌরজগতের আর কোনো গ্রহের নেই। শনির বলয়গুলির মধ্যবর্তী যে অঞ্চলগুলি ফাঁকা বলে মনে হয়েছিল, সেখানে রয়েছে একগুচ্ছ সরু সরু বলয়। সবকটি বলয়ই অমসৃণ এবড়োখেবড়ো কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি। কিন্তু মহাকাশযান ক্যাসিনির পাঠানো ছবিগুলি থেকে বিজ্ঞানীরা যে তথ্য পেয়েছেন তা বেশ ভয়ানক। শনির বলয় নাকি ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে। আর বলয়কে ঘিরে গড়ে উঠছে জমাট বাঁধা অক্সিজেনের ভান্ডার।

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী প্রাণের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন জলের। পৃথিবীর অনুরূপ বেশ কয়েকটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্হিবিশ্বের অনুসন্ধানে 'কেপলার' প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো' মহাকাশ বিজ্ঞানে চরম উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। ২০১৫ সালে ২৪শে জুলাই মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থা 'নাসা' এক চমকপ্রদ আবিষ্কারের কথা ঘোষাণা করেছিল, 'কেপলার' মিশনের জ্যোর্তিবিদেরা পৃথিবীর মতই প্রাণ সম্ভাবনা সম্পন্ন একটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'কেপলার- ৪৫২বি'। এটি পৃথিবীর মতো, যেখানে উন্নত পর্যায়ের প্রাণ সৃষ্টির মতো অনেকগুলি উপাদান উপস্থিত আছে। এই গ্রহটির ভর সূর্যের ভরের তুলনায় ১০৪% বেশি। পৃথিবী থেকে 'কেপলার-৪৫২বি' গ্রহটির দূরত্ব ১৪০০ আলোকবর্ষ। গ্রহটি 'হ্যাবিলেট জোনে' অবস্থিত। অর্থাৎ এই গ্রহটি প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত। বিজ্ঞানী-দের ধারণা এই নব আবিষ্কৃত গ্রহের তাপমাত্রা তরল জলের উপস্থিতির পক্ষে উপযুক্ত। এই গ্রহে প্রস্তর ও শিলাখন্ডের উপস্থিতির কারণে পৃথিবীর মতো এখানেও উদ্ভিদ, তৃণ, গুল্ম ইত্যাদি জন্মানো সম্ভব। সেইজন্যই 'কেপলার-৪৫২বি' গ্রহটিকে 'আর্থ ২.০' নামেও অভিহিত করা হয়।

২০১৩ সালে ৫ই নভেম্বর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-র 'পিএসএলভি' রকেট 'মম' এর যাএা শুরু হয়েছিল। ভারতের মঙ্গলযান 'মম' লাল গ্রহ মঙ্গলের পরিক্রমায় ২০১৭ সালে ১৯শে জুন ১০০০ দিন পার করে প্রায় ৭১৫ টিরও বেশি ছবি পাঠিয়েছে। 'মম' এ উপস্থিত রঙিন ছবি তোলার ক্যামেরাটি এখনও পর্যন্ত ১০০০ খানেক ছবি পাঠিয়েছে, বর্তমানে সেগুলির বিশ্লেষণের কাজ চলছে। লাল গ্রহ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নাসার মঙ্গলযান 'কিউরিওসিটি'। প্রথম চেষ্টাতেই সফলভাবে মঙ্গলযান পাঠিয়ে গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে ভারতবর্ষ। এবার সূর্যের উদ্দেশে রওনা দিল নাসার যান 'পার্কার সোলার প্রোব'।

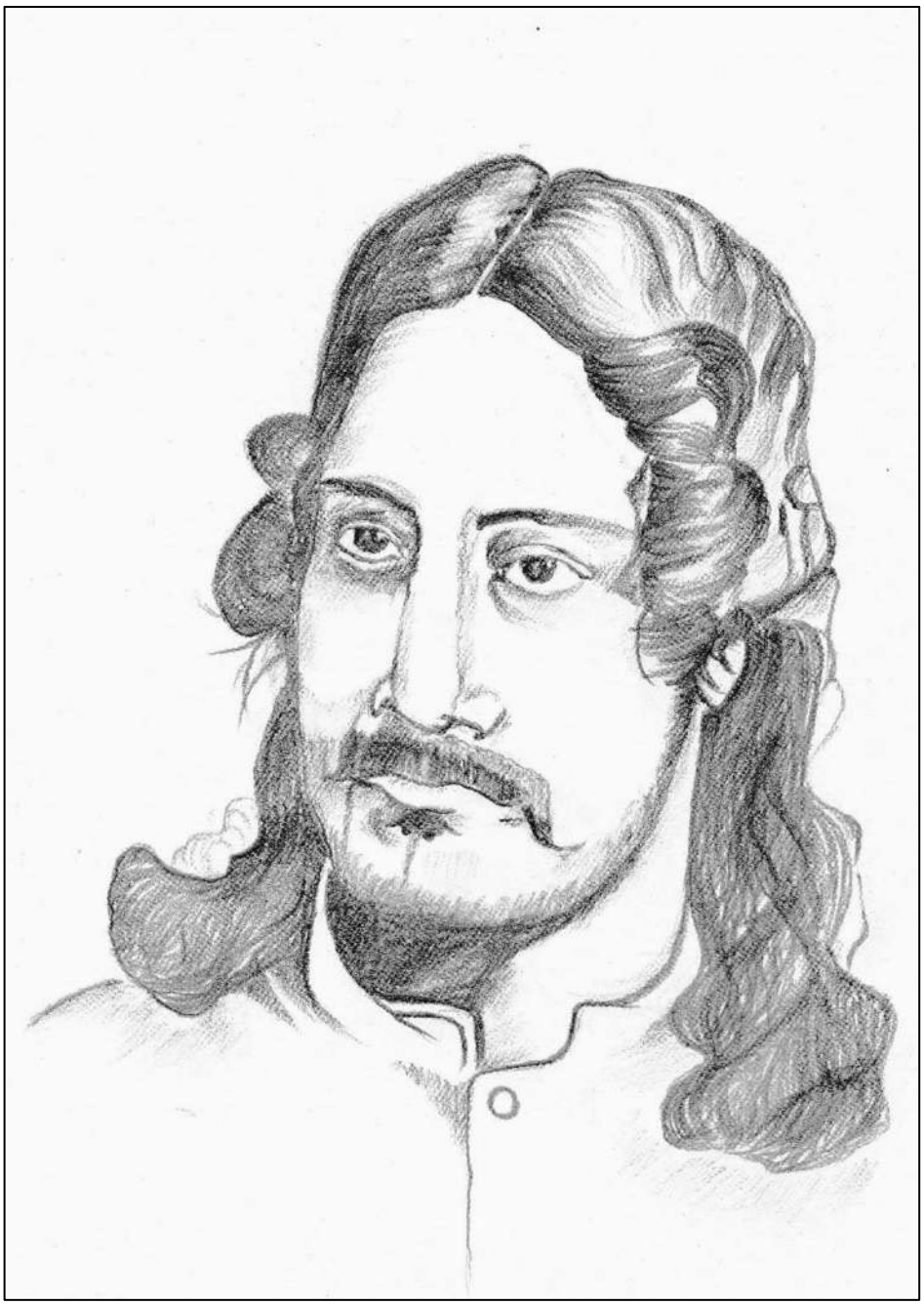

- Pratap Baj, Ex Student.

বাঙালিয়ানা

- শুভদীপ দে, প্রাক্তন ছাত্র

শব্দটির যে এত মাধুর্য সেটা যে বাঙালিয়ানাকে উপভোগ করেছে সেই একমাত্র বুঝতে পারবে! শব্দটি যতটা মিষ্টি তার থেকেও বেশি মিষ্টি তারা যারা এই শব্দটিকে আপন করে নিয়েছে। এটা যা তা কথা একদমই নয়! বাঙালি এমন একটি জাতি যাদের ইতিহাস সোনায় মোড়া এবং বর্তমানও তাই। ভবিষ্যতের কথা এখন ছেড়েই দিলাম। বাঙালি আর বাঙালিয়ানায় মিশে আমরা এই বেশ আছি বটে। আমরা এমন একটি জাতি যারা সবকিছুকে আপন করে নিয়েও নিজেদের ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছি। কলকাতার রাস্তায় ঘুরলে দেখতেই পাবেন বাঙালি রেস্তোরাঁর মতো বিভিন্ন ফুড-চেইন এর রেস্তোরাঁ ছেয়ে গেছে। আমরা যেমন দুর্গা পুজোর আনন্দ করি, তেমনই ক্রিস্টমাস বা ঈদেও করে থাকি।

বলতে গেলে বাঙালি কোন স্পেসিফিক রিলিজিয়ান এ বিশ্বাসী নয়, বরং তারা সবাইকে নিয়ে চলাতেই বিশ্বাসী। সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, চলচ্চিত্র, খেলাধুলা, খাদ্যাভ্যাস যাই বলুন, সমস্ত জিনিসকে সবার থেকে গ্রহণ করতে পেরেছে বাঙালি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের বাঙালিয়ানা কিন্তু অক্ষতই আছে। সবার ভালো জিনিসগুলিকে গ্রহণ করাই একটি প্রগতিশীল জাতির পরিচয়। আর বাঙালিরা সেটা খুব ভালোভাবেই সমাজকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

তাই বাঙালি অন্য কালচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও ইলিশ-চিংড়ি, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, রবি ঠাকুর-গীতবিতান, শাড়ি-পাঞ্জাবি, নলেন গুড়ের মিষ্টি, দুর্গাপুজো-সরস্বতীপুজোকে ছুড়ে ফেলে দেয়নি। নন্‌দন-ভিক্টোরিয়া, রবীন্দ্রসরোবর আজও বাঙালির কাছে সর্বকালীন সেরা জায়গাগুলোর মধ্যে একটা আর সবথেকে বড় কথা বাঙালিয়ানায় বারোমাসই প্রেমের মরশুম।

আজও বাঙালি রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত শোনে, মহীনের ঘোড়াগুলি তাদের নতুন করে বাংলাকে চেনায়। বাঙালি 'বেলা বোস' কে খোঁজে 2441139 এ। বাংলা ব্যান্ড বা বাংলা রক এখনও মানুষকে উত্তেজিত করে, আবার এই বাঙালিই প্রতিবাদে গর্জে ওঠে এবং বলে "কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট"।

বর্তমানে অনেককে বলতে শুনি বাংলা ভাষা আর চলে না। একথা সম্পূর্ণই ভুল, কারণ আজও বাঙালি গেয়ে ওঠে - "মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা"।

কিংবা তারা গায়- "আমি বাংলায় গান গাই
আমি আমার আমিকে
চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই"।

আবার আমরা যেকোনো পরিস্থিতিতেই একটা সুর কানে ভেসে আসা মাত্রই উঠে দাঁড়িয়ে বলি

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা"।

আমার কাছে এটি আমার বাঙালিয়ানা, যা অসীম দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, এর কোন অন্ত নেই।।

ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী শিক্ষাবর্ষ

- অরিত্র গুপ্ত, প্রাক্তন ছাত্র

শেষ হল প্রাথমিক শিক্ষা-
বয়স তখন নয়।
পরবর্তী উচ্চবিদ্যালয়-
কাটল আরও বছর ছয়।
হল মাধ্যমিক-
জীবনের বড় পরীক্ষা।
যদিও পরেরটা নাকি আরো বড়
বলছে সমীক্ষা।
বাড়ল সাহস-
একাদশ দ্বাদশ।
মাধ্যমিকে কি বা ছিল?
কি বা হয়েছে শ্রম;
উচ্চমাধ্যমিকের উচ্চ শিক্ষা
বদ্ধ করল দম!!
উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে উচ্চ-শিক্ষা নিয়ে-
সাঙ্গ হল পাঠশালা-
বিদ্যালয় তো গেল,
এবারে মহাবিদ্যালয়ের পালা।
মাঝের সময় গেল ছুটিতে?
না, না, সে ধারনা ভ্রান্ত-
জয়েন্ট একজাম করল প্রানান্ত।
নদী যেমন সাগরে মিশে
হারায় দিক বিদিক,
স্কুল কলেজের সম্পর্কটাও
তেমনি প্রাসঙ্গিক।
বলত সবাই ৯ টু ১২
এই ৪ টি ক্লাস;
ভাল করে না পড়লে
হবে সর্বনাশ।
তাঁদের কথা প্রতিবছরেই-
"এইত একটা বছর,
এটাই গড়বে জীবন"
বছর বছর এমন বছর
কাটল অতি গোপন।
মহাবিদ্যালয়ের পাঠ
সত্য গুরুত্বপূর্ণ-
সমাপনান্তে পঠন পাঠন,
শুরু হবে কর্ম জীবন।
এল প্রথম বর্ষ-
সামনে প্রশ্ন পত্র
নিভল মনের হর্ষ,
ইংরাজীতেই লেখা তো;
নাকি অন্য অজানা ভাষা?
এরম তিনটি বছরের শেষে-
ভাবি থামব অবশেষে।
কোথায় থামা কোথায় কি?
জ্যাম জেস্ট নেই কি!!
আবার শুরু পড়াশোনা
টিউশনি তে আনাগোনা-
টার্গেট মাস্টার ডিগ্রি-
এর কোন শেষ নেই,
চলছে চলবে—
আমাদের ও কোন ক্লান্তি নেই
প্রশ্ন শুধু একটাই-
কোন বছরটা তবে গুরুত্বপূর্ণ?
ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী?

প্রতিশোধ

- সায়ক ঘোষ, প্রাক্তন ছাত্র

"এতো মহা মুশকিলে পড়া গেল।" বলল অনিক। সৌমেন্দু বলল, "অনিক, আর একবার চেষ্টা করে দেখ না।" অনিক আবার গাড়িতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু দুবার ঘর্ঘর্ শব্দ করে গাড়িটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। অনিক বলল, "না ভাই আজ আর এর কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব না।" সৌমেন্দু একটা হতাশাজনক শব্দ করে বলল, "অগত্যা এই গন্ডগ্রামে মাঠের মাঝে রাত্রিযাপন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই?" অনিক বলল, "না আর কোনো উপায় নেই, আজ আর গাড়ি এখান থেকে এগোনো সম্ভব হবে না। আশেপাশে বাড়িঘরও তো তেমন দেখছি না। আর কিছুই করার নেই।"

অনিক, মিঠুন আর সৌমেন্দু ছোটবেলা থেকে একসাথেই বড়ো হয়েছে। তিনজনেরই পড়াশুনায় মন ছিল না ছোট থেকে। তবে মাথা ছিল খুব চৌখস। ক্রমে তারা তিনজনে অন্যতম ধুরন্ধর চোরাই গ্যাং তৈরি করে কলকাতার বুকে। পুলিশ কোনোমতেই তাদের ধরতে পারছিল না। তাদের মধ্যে লিডার ছিল মিঠুন। কিন্তু মাস চারেক আগে একটা চুরি করে ফেরার পথে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাতে গিয়ে মিঠুন মারা যায় কলকাতা থেকে দূরে এক গ্রাম্য এলাকায়। আর তারপর অনিক আর সৌমেন্দুও তাদের কাজ বেশ কিছু দিন বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু স্বভাববশত দুদিন আগে তারা আবার কাজে নেমেছে। গত পরশু তারা শিয়ালদা স্টেশনের কাছে হাতসাফাই করে কিছু টাকা সংগ্রহ করেছে। কিন্তু তাদের দুজনের কারুরই আর এই কাজ করতে ভালো লাগছিল না। রোজ দুশ্চিন্তা, পুলিশ এর তাড়া। তাই তারা ঠিক করেছিল একটা বড়সড় চুরি করে দূরে কোনও গ্রামে ঘাঁটি গেড়ে বাকি জীবনটা রাজার হালে কাটিয়ে দেবে। সেইমতো তারা আজ দুপুরে এক কোটিপতি স্বর্ণবিক্রেতার বাড়ি থেকে চুরি করে তারই গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয়। কোথা থেকে যেন খবর পেয়ে পুলিশ তাদের পিছু নেয়। তাদেরকে কোনো মতে কাটিয়ে ওরা ওদের প্ল্যান মাফিক গ্রামের দিকে যাচ্ছিল সেই রাস্তাতেই গাড়ি বিগড়ে গিয়ে তারা বেশ ফাঁপরে পড়েছে।

ওরা দুজনে বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলো রাতটুকু কাটানোর জন্যে একটা আস্তানা খোঁজার জন্যে। হঠাৎ অনেকটা দূরে একটা বাড়ির আলো দেখতে পেল। হয়ত আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। এই ভেবে তারা এগিয়ে গেল। বাড়িটার কাছাকাছি এসে তারা দেখতে পেল সেটা একটা বেশ বড়ো পুরনো দিনের বাড়ি, আসলে একটা হোটেল, নাম "হোটেল আপ্যায়ন"। তারা বেশ অবাক হলো এরকম একটা শুনশান এলাকায় এরকম বড়সড় একটা হোটেল দেখে। তাও ওরা মনে মনে ভাবল রাতটুকু তো কেটে যাবে। এই ভেবে ওরা হোটেলের ভেতরে গেল। ভেতরে ঢুকেই ওদের বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল। গা টা ছমছম করছিল। অনিক বলল, "ভাই সৌমেন্দু হোটেলটা তেমন ভালো লাগছে না। বেরিয়ে গিয়ে রাতটুকু গাড়িতেই কাটিয়ে দিলে হতো না?" সৌমেন্দু বেশ সাহসী সে বলল, " কি যে

বলিস এই ঠান্ডায় এত ভালো একটা থাকার জায়গা পেয়েও গাড়িতে গিয়ে রাত কাটাবো! দাঁড়া তুই আমি রিসেপশন-এ গিয়ে রুমের ব্যাপারে খবর নিই।" এই বলে সৌমেন্দু রিসেপশন-এর দিকে এগিয়ে গেল। অনিকও তার পেছন পেছন চলল। রিসেপশন-এ যে ভদ্রলোক আছে তার গলা অব্দি ওভারকোট, মাথায় টুপি। মুখ প্রায় দেখা যায় না। ওরা যেতে খ্যাসখ্যাসে গলায় বলল, "বলুন কি সাহায্য করতে পারি?" সৌমেন্দু গলাটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলেও সামলে নিয়ে বলল, "আপাতত রাতটুকু থাকার জন্যে একটা রুম হলেই চলবে।" রিসেপশনিস্ট লোকটি আর কিছু না বলে একটা চাবি এগিয়ে দিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে ওদের নিয়ে যেতে বলল। ছেলেটির চেহারা যতটুকু না হলে নয় তেমন। এরও আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে ঢাকা। সে বলল, "আসুন বাবু।" এর গলাটাও কেমন যেন অপ্রাকৃতিক। অনিক বেশ ভয় পেয়ে সৌমেন্দুর দিকে একবার তাকাল। সে তাকে হাতের ইশারায় জানিয়ে দিল এসব নিয়ে ভাবার দরকার নেই। সকাল হলেই বেরিয়ে যাবে ওরা এখান থেকে। ওরা রুমে ঢুকে দেখল বেশ পরিপাটি করে সাজানো বিছানা। দুজনেই হাত-পা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে শুতে যাবে এমন সময় দরজায় আওয়াজ শুনে অনিক দরজা খুলতে গেল। দরজা খুলে দেখল বেয়ারা ছেলেটি দাঁড়িয়ে। সে আবার সেই অদ্ভুত স্বরে বলল, "আপনাদের গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। আর একবার বাইরে আসুন। আপনাদের এক বন্ধু আপনাদের সাথে দেখা করতে চান।" সৌমেন্দু খুব চোটে গিয়ে বলল, "এখানে আমাদের কোনো বন্ধু থাকে না। এত রাতে এসব ভালো লাগছে না। ভাগ তো এখন। ঘুমোবো।" অনিক হঠাৎ বলল, "কিন্তু আমাদের যে গাড়ি খারাপ হয়েছে সেটা তোরা কিভাবে জানলি?" সৌমেন্দুও অবাক হলো। এই কথাটা তো সে খেয়াল করেনি। ছেলেটি বলল, "আমি অত জানি না। মালিক যা বলে করি। আপনারা দয়া করে চলুন।" সৌমেন্দু যেতে চাইছিল না। অনিক তাকে বলল চল না গিয়ে দেখি। তারা বাইরে গিয়ে দেখলো রিসেপশন-এ একজন লোক ওভারকোট পরে উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। তারা পৌঁছাতেই সে উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেই বলল, "কি বন্ধু খবর কি?" গলাটা শুনেই অনিক ও সৌমেন্দু চমকে উঠলো। এ কি করে সম্ভব এতো মিঠুনের কণ্ঠস্বর। অনিক কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, "কে?" লোকটা উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেই বলল, "সত্যিই কি চেনা যাচ্ছে না?!" সৌমেন্দুও বেশ ভয় পেয়েছে কিন্তু সেটা চাপার জন্যেই হয়ত অতিরিক্ত জোর গলায় বলল, "রাতবিরেতে মস্করা হচ্ছে! জানেন আপনাদের হোটেল আমি উড়িয়ে দিতে পারি।" এরপর লোকটি বলল, "মস্করা আমি তোদের সাথে করতাম, যখন তোরা আমাকে মারিসনি।" এই বলে লোকটা ওদের দিকে মুখ ফেরাল। কি বিভৎস সেই মুখ। অর্ধেকের বেশি পুড়ে গেছে। একটা চোখ নেই। সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁটের একটা দিক ঝুলে পড়েছে। আতঙ্কে অনিক চোখ বন্ধ করলো। সৌমেন্দু বলল, "এ কি! মিঠুন তুই? এ কি অবস্থা তোর! তুই বেঁচে আছিস!" মিঠুন বলল, "এ অবস্থা তো তোরাই করেছিস। আর আগুনে পুড়িয়ে মারার পর কেউ কিভাবে বাঁচতে পারে? তোরা পেরেছিস কাজ সফল করতে। কিন্তু কেন? কি এমন করেছিলাম আমি? নিজে সব প্ল্যান করার পরও তো কোনোদিন ভাগ-বাটোয়ারা করার সময় তোদের থেকে বেশি ভাগ নিই নি। তাও কেন মারলি আমায়? আবার সমাজের কাছে আমার মৃত্যুটাকে একটা দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে নিজেদের নৃশংস হত্যালীলা ঢাকা

দিয়ে দিলি!" রাগে গা কাঁপতে থাকে মিঠুনের। অনিক আর সৌমেন্দুর হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। সৌমেন্দু কাতর কণ্ঠে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, "মিঠুন ভাই আমরা লোভে পড়ে একটু ভুল করে ফেলেছি। ক্ষমা করে দে ভাই।" খিলখিলিয়ে হেসে উঠে মিঠুন বলে, "ক্ষমা! তোদের ক্ষমা করা যায়না। আমিও সেদিন বলেছিলাম আমাকে ছেড়ে দিতে। তোরা দিসনি। গাড়ির ব্রেক খুলে নেবার পরে গাছে ধাক্কা মেরেও আমি মরিনি বলে এই শুনশান পোড়ো বাড়ির কাছে নিয়ে এসে গাড়ি সহ জ্বালিয়ে দিয়েছিলি। মনে আছে সেসব? খুব মজা লাগছিল তোদের! ভাগ্যের কি খেলা দেখ আজ পালানোর জন্যে তোরা এই পথটাই ধরলি। আর আমার হাতে কেমন সুন্দর সুযোগ এসে গেল তোদের কর্মফল দেবার। আজ একই কাজ আমি তোদের সাথে করবো।" অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো মিঠুন। অনিক তার সামনে বসে হাতজোড় করে বলতে থাকলো, "ক্ষমা কর মিঠুন। আর হবে না।" মিঠুন বলল, "বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা করা যায় না। মরতে তোদের হবেই। ঠিক আমার মতো করেই।" সৌমেন্দু ছুটে দরজার দিকে গেল। কিন্তু দরজা খুললো না। হঠাৎ বাড়ির মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। মিঠুন হাসতে হাসতে বলতে লাগল, "প্রতিশোধ! আকাঙ্খিত প্রতিশোধ! শান্তি! কি পরম তৃপ্তি!" মুহূর্তে সারা হোটেল জ্বলে উঠলো। অনিক আর সৌমেন্দুর মৃত্যুযন্ত্রণাভরা আর্তনাদ আর মিঠুনের গগনভেদি হাসি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

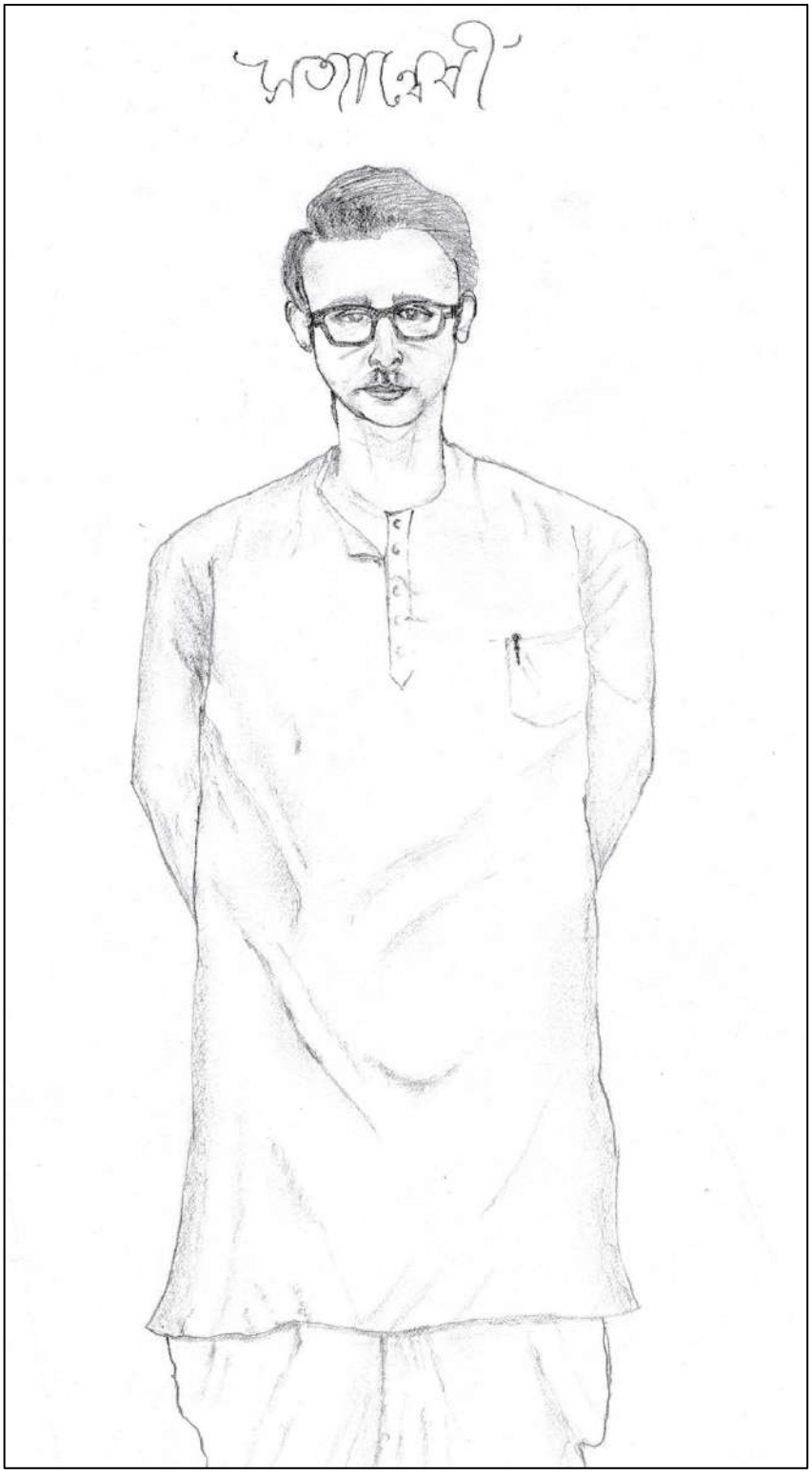

- Debjit Maji, Ex Student.

পলায়ন

- দুর্লভ দত্ত, প্রাক্তন ছাত্র

লাইনের ধারে পড়ে থাকা পাথর গুলির দিকে তাকাতে তাকাতে মাথাব্যথা শুরু করেছে রবির। ভাগ্যক্রমে ট্রেনের জানালার ধারে একটি সিট জোটাতে পেরেছে সে। টিকিট করে দিয়েছে তার বন্ধু অনিমেষের বাবা। রেল কোম্পানির এজেন্ট তিনি। একবার যদি রবি কলকাতা অঞ্চল পেরিয়ে যেতে পারে আর চিন্তা নেই তার। কানপুরে তাকে পাকা বন্দোবস্ত করতেই হবে, এই চিন্তা নিয়েই যাচ্ছে। অবশ্য সেখানে রয়েছে তার পরিচিত ত্রিয়োগি তিওয়ারী। তার সাথে যোগাযোগ করেই সে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে বলার থেকে পালাচ্ছে বলাই ভালো।

গল্পের শুরুটাতেই রবির সম্পর্কে একটু জানিয়ে রাখি। আর গল্পের নামই এরকম 'পলায়ন' কেন রাখলাম। সেটা নিয়েই এই ছোট গল্প। রবির পুরো নাম রবীন্দ্রনাথ দাস। ছোটবেলাতেই বাবা-মা দুজনেই পৃথিবী ছেড়ে পরলোকে গমন করেছেন। কাকার কাছেই ছোট থেকে বড় হয়েছে। কিন্তু বড় হয়েছে বলার থেকে শুধু গায়ে-গতরে বেড়েছে বলাই ভালো, মাথায় এক টুকরোও সুবুদ্ধি নেই। কাকা স্কুলে ভর্তি করেছিল। প্রথমদিনেই মাস্টারের পকেট থেকে পাঁচশ টাকা চুরি করেছিল ছ'বছরের ছোট্ট রবি। বাচ্চা হওয়ায় অল্প প্রহারের পরে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল মাস্টারমশাই। কিন্তু এতে রবি দমার পাত্র নয়। এর পয়সা, ওর টিফিনবক্স, ওর পেন্সিল বক্স চুরি করতে লাগলো। দু'মাস পরে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল হেডমাস্টার। স্কুল থেকে তাড়া খেয়ে বাড়িতেই থাকে রবি। পাড়ার লোকেরাও নিন্দে করতে লাগলো। এরপরেও লোকের গাছের ফল, কারো বাড়ি থেকে বাসন, এগুলো সুযোগ পেলেই ভরদুপুরে চুরি করত রবি। কাকা প্রথম প্রথম রবিকে পেটালেও পরে তার পক্ষপাতিত্ব করতে লাগলো। এই কাকা ছিল এলাকার অন্যতম মাতব্বর। তার কাজ ছিল বিভিন্ন বেআইনি অসম্পূর্ণ কাজগুলিকে সম্পূর্ণ করা, জায়গার বিনিময়ে। কাকা ভাবল রবিকে তার দিকে টেনে নিলে মন্দ হয় না। রবি একটু বড় হয়েছে, এরই মধ্যে সে কাকার ডান হাত। পুলিশও টাকা খেয়ে তাদের সাপোর্ট দিচ্ছে।

রবির যখন বয়স আঠারো তখন তার মাথার ওপর খুনের দায় আসে। সে যাত্রায় অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে কাকা তাকে মুক্ত করে আনে। ট্রেনে যেতে যেতে সেগুলোই চিন্তা করছিল সে। বর্ধমান আউটারে দাঁড়িয়ে ট্রেন। সিগন্যালের অপেক্ষায়। খুনের দায়ের পর সে এইসব থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, আর তার ভাল লাগছিল না এইসব। কিন্তু কাকা তাকে অনেক করে বুঝিয়ে ধরে রেখেছিল তার গ্যাং এ। যে ছেলে শিক্ষার আলোতে আলোকিত হয়নি তাকে ভুল বোঝানো অনেক সহজ। এরপর থেকে রবিকে কাকা বিশেষ জায়গাগুলোতে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তাকে শুধু রোজ একবার করে কলকাতা থেকে যেতে হত বারাসাত। সাথে থাকতো একটি ব্যাগ। ব্যাগটি বারাসাতের নামকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার

অজিত সরকারের হাতে দিয়ে আসত সে। কিন্তু ব্যাগের ভিতরের সামগ্রী খুলে দেখাতে নিষেধাজ্ঞা ছিল তার উপর।

শিয়ালদহ থেকে দমদম হয়ে বারাসাত দশটি স্টেশন। যেতে আসতে তার ঘন্টা তিনেক সময় লাগতো। এই কাজ সে দুই মাস ধরে করছে। এই সময়ে একটু একটু করে তার পরিবর্তন আসে মানসিক চিন্তাভাবনায়। তারই বয়সী ছেলেমেয়েরা কলেজে পড়ে। কেউ কেউ ছোটখাটো চাকরিও করে। প্রত্যেক দিনের কাজের জন্য তার আয় হত পাঁচশ টাকা করে। সে ওই পয়সা থেকে কোন কোন দিন স্টেশনের ধারে থাকা অনাথ শিশুদের ফল, খাবার ইত্যাদি কিনে দিত। ভিক্ষুকদের পয়সা দিত। একদিন ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হসপিটালের লোকেরা অনুদান তুলতে বেরিয়েছে দেখে সে পুরো পাঁচশ টাকাটাই তাদের দিয়েছিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন এক ভদ্রলোক। তিনি এগিয়ে এসে রবিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন নাম ঠিকানা ইত্যাদি। রবি প্রাথমিকভাবে একটু ইতস্তত বোধ করলেও পরে নিজের সম্পর্কে সব খুলে বলল। তিনি বুঝতে পারলেন শিক্ষা আর সঠিক পথদিশারির অভাবে এরকম হয়েছে ছেলেটি। একটা কার্ড দিলেন। বললেন এটি দেখিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে তার ঠিকানা বলে দেবে এবং সে যেন সেই রাস্তা ধরে তার কাছে চলে আসে। ভদ্রলোকের নাম ত্রিয়োগি তিওয়ারী।

একদিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে রবি সোজা চলে গেল গড়িয়া অটো স্ট্যান্ড। সেখানে কার্ডটা দেখাতে তাকে অটোচালক নির্দিষ্ট বাড়িতে নিয়ে গেল। ভাড়া মিটিয়ে নেমে এসে বাড়ির বেল বাজালো রবি। চাকর দরজা খুলে দিল। কার্ডটা দেখাতে তাকে ড্রয়িংরুমে বসতে বলল ডেকে। ত্রিয়োগীবাবু আসার আগে ভালো করে রবি দেখল চারদিক। প্রচুর দামি জিনিস ছড়ানো চারিদিকেই। কিন্তু রবির হাতগুলো গোটানো অবস্থাতেই রইল। ত্রিয়োগীবাবু এসে তার সামনেই বসলেন। তার সাথে কথা বলে রবি বুঝল ভদ্রলোকের প্রচুর পয়সা। কিন্তু থাকেন একা। বিয়ে করেননি। উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহরে তার বড় কোম্পানি আছে। মাড়োয়ারি হলেও বাংলা বলেন খাসা। চা-মিষ্টি এসেছিল আগেই টেবিলে। খেতে খেতে রবিকে বললেন- 'তোমার মত ছেলে আমি খুবই কম দেখেছি। এত ধনী না হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে তুমি প্রত্যহ বাচ্চাদের খাবার কিনে দাও, ভিক্ষুকদের পয়সা দাও আমি দেখে খুশি। বারাসাতে আমার একটা ছোট্ট কোম্পানি আছে। সেখানে যাই। কিন্তু ট্রেনেই যাই। গাড়ি কিনিনি কারন থাকি একা। একা একা গাড়ি চালাতে কার ভালো লাগে বলো। যদি কখনও কোনো দরকার পড়ে আমার সাথে যোগাযোগ কোরো। যদিও আমি কানপুর চলে যাচ্ছি পরের মাসে। কবে আসবো কোন ঠিক নেই। এখানকার কোম্পানি ম্যানেজারই সামলাবে।'

রাস্তায় বেরিয়ে বেশ চনমনে লাগলো রবির মনটা। ভাবল এই ব্যক্তির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার। ভুল পথে এতদিন সে চলেছে। কিন্তু এবার দরকার একজন যোগ্য পথপ্রদর্শক। সেদিন ফিরতে দেরি হওয়ায় কাকা বেশ চিন্তায় ছিল। বাড়ি ফিরে রবি বিশেষ কিছু না জানিয়ে বলে দিল ট্রেন দেরি করেছিল।

এরপর থেকে সপ্তাহে এক-দুবার করে রবির তিওয়ারী বাবুর বাড়িতে না গেলেই চলছিল না। তিওয়ারি বাবুও বেশ খুশি হতেন রবির সাথে কথা বলে। রবি খুব ভালো চেকার্স খেলতে পারত। সেই খেলে জুয়াতে অনেক পয়সাও পেয়েছিল ছোট বয়সে। হাতে খড়ি অবশ্য কাকার হাতেই। তিওয়ারী বাবুও খেলায় কম যান না। ভালো জমত আসর দুজনের। এরকমভাবে চলতে চলতে একদিন রবি এসে দেখলো বাড়িতে তালা, গেটে তালা। একটু আশপাশে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল তিনি কানপুর চলে গেছেন। এরকম বিনা খবরে চলে যাওয়ায় মনে বেশ দুঃখ পেল রবি। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে রবি দেখল গাড়ি আসানসোলে দাঁড়িয়ে। ঝট্ করে নেমে কিছু খাবার আর জলের বোতল কিনে ট্রেনে উঠে এল। পকেটে এখনও তিনশ টাকা আছে।

তিওয়ারীবাবু কানপুর চলে যাওয়ার পরের দিন রবি বারাসাত যেতে চায়না আর। দুদিন- তিনদিন এরকম চলার পরে কাকার সাথে প্রবল ঝগড়া হয়। কাকা বলে হয় কাজ কর না হয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের রাস্তা নিজে দেখ।

রবি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিত যদি একটু লেখাপড়া জানত। কানপুর জায়গাটা আসলে কোথায় তাই তার জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত কাকার সাথে এতদিন থেকে তার ওপরে স্নেহ হয়েছিল তার। আর তখন বিলাসবহুল বাড়ি ছেড়ে কারই বা নিজের রাস্তা তৈরি করার শখ হতে পারে। তাই সেদিন ব্যাগ নিয়ে বেরোল রবি। আজ, শিয়ালদহ স্টেশনে জায়গায় জায়গায় পুলিশ পোস্টিং। ভিড়ও বেশি অন্যান্য দিনের চেয়ে। একজন টিকিট পরীক্ষককে জিজ্ঞাসা করায় রবিকে তিনি বললেন - 'প্রত্যহ প্রায় কুড়ি লাখ টাকার ড্রাগস ট্রেনে পাচার হচ্ছে। খবর এসেছে শিয়ালদহ থেকেই ট্রেনে করে কেউ নিয়ে যাচ্ছে বারাসাতের দিকে। তাই লালবাজার থেকে এই ব্যবস্থা।' রবির বুকটা ধড়াস করে উঠল। সেও যাচ্ছে বারাসাত। সাথে ব্যাগও আছে। ড্রাগস আগে দেখেছে রবি। কাকার কাছে অনেকে আসত ড্রাগস দিতে নিতে। কিন্তু গোপনে। তবে ওইটুকু সাদা আটা-ময়দার মতো বস্তুর অতটা দাম ভাবতে পারা যায় না। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইতিমধ্যেই। তবে তাদের মধ্যে কেউ নয়। রবি বনগাঁ লোকালে উঠে পড়ে। একটা কোনে বসে ব্যাগটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর চেনের একটা টান পড়তেই একটু সাদা পাউডারের গুঁড়োর মতো জিনিস উড়ে আসে। রবির হাঁচি শুরু হয়। চেনটা তখনই বন্ধ করে দেয় সে। আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে না তার। তাহলে এতদিন ধরে তার কাকা তাকে দিয়ে এই কাজ করাত। আশ্চর্যজনকভাবে সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যাকে রবি ভালো ভাবত তিনিও এইসবের সাথে যুক্ত। ডাক্তারির পিছনে এইসব চলে। এইসব ভাবতে ভাবতে একজন যাত্রীর রবিকে সন্দেহ হয়। তিনি পুলিশ ডাকতে গেলে ভাগ্যক্রমে ট্রেন শিয়ালদা ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বিধাননগরে ট্রেন দাঁড়ালে রবি নেমে যায় ট্রেন থেকে। প্লাটফর্মে বসে। পুলিশ যাত্রীটির কথামতো কাউকে খুঁজে না পেয়ে ফেরত চলে আসে। ভাগ্যবশত রবি আপনি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ডাউন লাইনের প্লাটফর্মে এসে বসেছিল ফাঁকা পেয়ে। পুলিশ তাকে দেখতে পায়নি। অবশ্য তার খোঁজ শুরু হয়ে গেছে। সেদিনই রবিকে তার বন্ধু অনিমেষ খবর দেয় এই

ব্যাপারে। ধরা পড়লে রবির ন্যূনতম পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। তাই বাবাকে বলে অনিমেষ সকালে টিকিট করে রবির কানপুর যাওয়ার ব্যবস্থা করে। কানপুর যাওয়ার ব্যাপারে রবিই তাকে বলেছিল। কাকা অবশ্য রবির খোঁজে কিছু লোক লাগিয়েছিল। বলেছিল খোঁজ পড়লে তাকে যেন পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। এই খবরও রবিকে অনিমেষ দিয়েছিল স্টেশনে। জীবন ও কারাদণ্ড বাঁচাতে রবি ট্রেনে বসে চলেছে কানপুর। সেখানে তিওয়ারী বাবু কোথায় থাকেন কিছুই সে জানেনা। শুধু জানে যেতে হবে কানপুর। কিংবা পালাতে হবে এখান ছেড়ে ওখানে যদি বেঁচে থাকার হয় তবে। গাড়ি লম্বা হর্ন দিয়ে আসানসোল ছেড়ে এগিয়ে চলল।

ভীতু

- ডঃ দিব্যেন্দু নন্দ, প্রাক্তন ছাত্র

পৃথিবীর শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত!
আমরা দেখছি তাকিয়ে।
আঁচড়ের দাগ দূর থেকেও স্পষ্ট।
স্তব্ধ বিকেলে মন্দির বা মসজিদে কেউ নেই।
শুধু প্রাণহীন কিছু শরীর এখানে ওখানে ছড়িয়ে।
আমরা যথারীতি রক্তের ছোঁয়া এড়িয়ে,
মৃত শরীর ডিঙিয়ে দিব্যি হেঁটে চলেছি।
দুএকবার কয়েকজন পেছন ফিরে তাকিয়ে
কিছুই করার নেই বলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি।
আমিও তাদেরই দলে। নীরব দর্শক।
চোখে মুখে স্পষ্ট হতাশার ছাপ।
আশার কথা যার শোনানোর ছিল
তাঁর শরীর জুড়ে মৃত শ্যাওলা।
আর আমি বড্ডো ভীতু।
তাই ডাইরী আর Whatsapp জুড়ে
অযথা কবিতার ভীড়।

যুবসমাজের প্রতি

- অচেনা কবি

একটা কবিতা রচনা করো হে নবীন কবি!
কথা কলি বেরিয়ে আসুক হৃদয়ের অন্তর হতে,
হোক না শব্দগুলি কুৎসিত,
তবুও তা যেন শিরায় শিরায়
বিদ্যুতের সঞ্চার করে।

কাব্যের প্লাবন নেমে আসুক আজ এই দিনে,
সমাজের আজ-
বড়োই খারাপ অবস্থা, যা দেখা যায় না
লোকে মরছে ক্ষুধার জ্বালায়, দারিদ্র্যতার চরম কষ্টে!
এ যে আর দেখা যায় না।

একটা কবিতা রচনা হোক হে নব যৌবন
শিরায় বইছে বিক্ষোভের আগুন,
প্রতিবাদী দৃষ্টিদল ডেকেছে মিছিল।

হে নবীন
আজ কবিতার বাগানে জমে উঠেছে বারুদের স্তুপ,
আর চারদিকে খালি বারুদের গন্ধ;
তোমার কলমই হল আমাদের ঝাড়ু,
আমাদের প্রতিবাদের ভাষা।

একদিন তোমার কলমেই এই অন্ধরা-
নতুন চক্ষুলাভ করবে!
দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে।

একটি কবিতা রচনা হোক, হে নব জীবনের দূত
একটি কবিতা রচনা হোক ।।

এটাই শেষবার

- ইরফান হাবিব, প্রাক্তন ছাত্র

দরজায় খট্ খট্ শব্দ এবং এলার্মের শব্দে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। দরজার বাইরে থেকে কে যেন বলছে, 'ম্যাক, এই ম্যাক, টিউশন যাবি না?' ম্যাক ঘুমের ঘোরে বলল, 'হুমম'। এবার বাইরে থেকে জোরে শব্দ এলো, 'ম্যা.....ক, টিউশন যাবি না?' তারপর ম্যাক তাড়াতাড়ি উঠে বলল, 'দাঁড়া একটু ভাই।' দরজা খুলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর আরও এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। তারপর উঠে ব্রেকফাস্ট করলাম সকাল ন'টায়। সাধারণত আমরা ন'টা বা সাড়ে ন'টায় উঠতাম।

ম্যাক, এবং আমি জন, নাম দুটো শুনে বিদেশি মনে হলেও, আমরা খাঁটি বিশুদ্ধ বাঙালি পরিবারের খাঁটি সন্তান। আমরা দুজনে একই রুমে হোস্টেলে থাকতাম। ম্যাক ছিল অতিরিক্ত দয়ালু ও ভালো মনের ছেলে। কোন বন্ধু কিছু বললে নাকচ করতে পারত না। এইতো কিছুদিন আগে একজন বন্ধু হাসপাতালে ভর্তি ছিল। সেখানে রাত্রে কে থাকবে? কে আবার ম্যাক। আবার কারোর মোবাইল চুরি হয়েছে। থানায় ডায়েরী করতে যাবে সাথে যাচ্ছে ম্যাক। তার শুধুমাত্র একটাই দোষ, সে একটা মারাত্মক নেশা করে এবং কোনভাবেই ছাড়তে পারেনা। তাকে কেউ দেখে ফেললে বা বললেই সে বলে, 'ভাই, এটাই শেষবার'।

সকাল সাড়ে দশটায় আমি কলেজ বেরিয়ে পড়লাম। আর ম্যাক টিউশন থেকে সরাসরি কলেজ চলে যায়। মাক খুব ভালো ক্রিকেট খেলতো। তাই সে মাঝেমধ্যে কলেজ থেকে ফেরার পথে ময়দানে ক্রিকেট খেলতে যেত। আমিও সেখানে এক দু'দিন ঘুরতে যেতাম। ঘুরতে যাওয়া তো আমাদের সাধারণত খুব একটা হয়ে উঠত না। একসাথে সবাই বেড়ানো তো কল্পনাতীত ছিল। তবে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও দুর্লভ মুহূর্ত ছিল রবিবারের সকাল। আমরা প্রত্যেক রবিবার সকাল আটটায় ম্যাথমেটিক্স জেনারেলের টিউশনে প্রায় ছ'জন একসাথে পড়তে যেতাম, হাতিবাগানে। একেই ম্যাথ জেনারেল তার ওপর রবিবার সকাল, ফলে সকালে ঘুম ছেড়ে উঠতে ভালো লাগত না। কিন্তু সেখানে একটি পুরীর দোকান ছিল। সেখানে অসাধারণ স্বাদের পুরী ছাড়াও জিলিপি পাওয়া যেত। ওই দোকান আমাদের সমস্ত বিরক্তির ইতি টেনে মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতো। আমরা সেখানে নেমে প্রথমে দোকানটা একবার দেখে নিয়ে তারপর টিউশন পড়তে ঢুকতাম। পড়ে বেরিয়ে সবাই ওখানে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে তারপরে রওনা দিতাম। যেহেতু সেদিন একঘন্টা পরে আরেকটি অনার্স পেপারের টিউশন থাকতো, তাই এসে কিছুক্ষণ কলেজ স্কোয়ারে বসে থাকতাম। রবিবারের সকাল এগারোটার কলেজ স্কোয়ার অন্যদিনের তুলনায় অনেকটা অদ্ভুত বলে মনে হতো। আমরা সবাই তাকে 'মিনি মেন্টাল হসপিটাল' বলতাম। কেউ পাশে বসে অন্যের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ বা পাশে নির্দ্বিধায় বায়ু সরাচ্ছে। আর একজন স্পেশাল মহিলা ছিল তাকে

দেখে আমার খুব ভয় করত, কারণ, সে যখন তখন যে কারোর সামনে গিয়ে অনর্গল ইংলিশে বা কখনো বাংলায় গালি দিয়ে ধুয়ে দিত। তাই আমরা সাধারণত একটা স্পেশাল কর্নারে বসতাম তার নজর এড়িয়ে।

যাইহোক, আমরা সাধারণত সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় টিফিন করে পড়তে বসতাম। তারপর আবার সাড়ে ন'টায় ডিনার করতাম। কিন্তু সেদিন হঠাৎ আমার একটা কাজ পড়ায় আমি রাত্রে শিয়ালদহে একজন বন্ধুর কাছে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। ম্যাক কে বললাম, 'ঠিক আছে, সাবধানে থাকিস। আমি সকালে আসব।' রাত্রি কেটে গেল, সকালে আমি যখন এসে দরজায় উপস্থিত হলাম, ম্যাককে ডেকে দরজা খুলতে বলে দরজায় হাত দিতেই দরজাটি খুলে গেল। আমি ভাবলাম সে হয়তো দরজা না লাগিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ফলে রাগও হল, কারণ চুরি হলে বিপদ। স্বভাবতই আমি রুমে ঢুকে তাকে একটা লাথি মেরে বললাম, 'কতক্ষণ ঘুমাচ্ছিস, উঠবিনা?' লাথি মারাটা যদিও আমাদের দুজনেরই অভ্যাস ছিল। তাই কেউ কিছু মনে করতাম না। কিন্তু রুমের লাইটটা অন করতেই তার ঘুমানোর ধরন দেখে আমার কিরকম যেন মনে হল। আমি তার কপালে হাত দিয়ে দেখলাম, শরীর হিমের মত ঠান্ডা। তারপর পালস্ চেক করে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আর আমার অজান্তেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। পাশের রুম থেকে কয়েকজন ছেলে এল এবং মারা যাবার কথা শুনে রুমে একটা শোরগোল পড়ে গেল। বুঝলাম গতকাল রাত্রে সে আবার সেই মারাত্মক নেশার কবলে আচ্ছাদিত হয়েছিল। যখন দুঃখ ও শোকে মৃতদেহের পাশে বসে চিরন্তন ঘুমে আচ্ছাদিত আমার হৃদয়ের সবচেয়ে নিকট বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, তখন আমার মনে কেবলই এক অতি পরিচিত কিন্তু বহুদূরের ভেসে আসা কণ্ঠস্বর যেন বলে যেতে থাকলো, 'এটাই শেষবার। এটাই শেষবার।'

সিকিমযাত্রীর ডায়েরী: রডোডেনড্রন ট্রেক ও অন্যান্য

- ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জী, প্রাক্তন ছাত্র

পর্ব ১: ভার্সেই রডোডেনড্রন ট্রেক, পশ্চিম সিকিম

২৯শে মার্চ, রাত ১১টা: ১২৩৭৭ আপ পদাতিক এক্সপ্রেসের স্লিপারক্লাসে বসে যখন এবারের ট্রেকের ডায়েরী লিখতে শুরু করছি, তখন এই মার্চের শেষেই কলকাতায় পারদ ৩২ ডিগ্রীর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে আর্দ্রতা। সবমিলিয়ে গরমের শুরুতেই বেশ নাস্তানাবুদ অবস্থায় দিন কাটছিল, তাই হঠাৎ করেই সপ্তাহখানেক আগে সিকিম যাবার এই সুযোগটা পেয়ে গিয়ে প্রায় লটারি পাওয়ার মতই মনটা নেচে উঠেছিলো। পাহাড়, বা বলা উচিত, হিমালয়কে যারা ভালবাসে, সিকিম মানেই তাদের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ভারতের উচ্চতম এই শৃঙ্গের টানে প্রায় সারাবছরই পর্যটক আর অভিযাত্রীদের গন্তব্য হয়ে ওঠে পূর্ব ভারতের এই ছোট্ট রাজ্যটি। ট্যুরিস্ট স্পট, ট্রেক রুট, ক্লাইম্বিং, ক্যাম্পিং, এক্সপিডিশন, সব মিলিয়ে পাহাড়পাগল মানুষের পক্ষে সিকিমের আকর্ষণ কাটানো সত্যিই দুষ্কর।

আমাদের ন'জনের দলটার এবারের লক্ষ্য পশ্চিম সিকিমের ভার্সেই (Varsey) রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারি এবং রডোডেনড্রন ট্রেক। একদিনের বা বলা ভালো একবেলার ছোট্ট ট্রেক, কাঠিন্যর বিচারেও সাদামাটা, তবে গোটা পথটাই রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারির মধ্যে দিয়ে আর এই মার্চ মাসে সে পথ যে নানা রঙের রডোডেনড্রনে রঙিন হয়ে থাকবে সেটা বলাই বাহুল্য। অন্য অনেকের মতই রডোডেনড্রনের নামের সঙ্গে আমার পরিচয় মহিনের ঘোড়াগুলির বিখ্যাত গান 'তোমায় দিলাম' এর হাত ধরে। যদিও রডোডেনড্রনের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব এর থেকে অনেকটাই বেশী। গ্রিক শব্দ 'রডো' অর্থাৎ গোলাপ এবং 'ডেনড্রন' অর্থাৎ গাছ, এই দুই শব্দ মিলিয়ে পাওয়া যায় রডোডেনড্রন, যা মূলত এশিয়া মহাদেশীয় পার্বত্য অঞ্চলের গাছ এবং গোলাপের মতই বিভিন্ন রঙের উজ্জ্বল ফুলের জন্য পরিচিত। ভারত ছাড়াও প্রতিবেশি দেশ নেপালের পার্বত্য অঞ্চলেও রডোডেনড্রনের (যাকে নেপালি ভাষায় 'গুরাস' বলা হয়) আধিপত্য উল্লেখযোগ্য এবং সে কারণে নেপালের জাতীয় ফুলের মর্যাদাও এই রডোডেনড্রনকেই দেওয়া হয়েছে। রডোডেনড্রন ট্রেক ছাড়াও পশ্চিম সিকিমের ওখরে (Okhrey) থেকে গোরখে (Gorkhey) অবধি আরেকটা ছোট ট্রেকের প্ল্যানও করা হয়েছে, যেটা আবার ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। আর সবশেষে, যাকে বলে cherry on the icing, সেটা হল ভার্সেই থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। হিমালয়ের সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য আমার আগেও কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু সিকিমে এটাই আমার প্রথম ট্রেক। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার প্রত্যাশা আর উত্তেজনা দুটোই আলাদা করে অনুভব করছি ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই। দলের কয়েকজনের এটাই আবার প্রথম পাহাড়যাত্রা, তাই বাকিদের দেখছি বেশ কিছুক্ষণ থেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা তাদের শোনাতে ব্যস্ত। আমিও ক্রমে বুঝতে পারছি গল্প শোনানোর ইচ্ছেটা গল্প শোনার থেকে বিশেষ কম নয়। কাজেই এবার লেখা থামিয়ে আড্ডাতে যোগ দিই।

৩০শে মার্চ, বিকেল ৪টে: সকাল দশটা নাগাদ শিলিগুড়ি পৌঁছে, খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে, রীতিমতো দরদামের পর সুমো বুক করে ওখরের উদ্দেশে রওনা হতে হতে আমাদের হয়ে গেল প্রায় বেলা সাড়ে বারোটা। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যতবারই আসি, ততবারই স্টেশনটাকে নতুন করে ভালো লাগে। খোলামেলা, লম্বা লম্বা, ঝকঝকে প্ল্যাটফর্ম, দূরে আবছা সবুজ পাহাড়ের সিল্যুট, দূরপাল্লার ট্রেনের আসাযাওয়া আর মানুষের ব্যস্ততার ফাঁকে প্রায় চোখেই পড়েনা একধারে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের টয় ট্রেনের প্ল্যাটফর্মটা। সব মিলিয়ে স্টেশনে নেমেই মনটা ভাল হয়ে যায়। সাধারণত ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের দোকানে একপ্রস্থ চা-পর্ব সেরে, ওয়েটিং রুমে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তারপর আমরা রওনা দিই, তবে এবার হাতে সময় না থাকায় বেশ তাড়াহুড়ো করেই আমাদের বেরোতে হল শিলিগুড়ি ছেড়ে। তারপর অবশ্য রাস্তা ভালো হওয়ায় আর আমরা মাঝে প্রায় কোথাও না থামায় মোটামুটি ঠিক সময়েই আমরা এখন সোরেংএ (Soreng) এসে পৌঁছেছি। সোরেং ওখরে থেকে প্রায় তিরিশ কিমি আগে একটা ছোট জনপদ যেটা মূলত তার ইকো-ট্যুরিজমের জন্যে পরিচিত। যদিও আমাদের এখানে থামা আমাদের পেটে একটু খাবার আর আমাদের গাড়ীর ট্যাঙ্কে একটু তেল ভরার জন্যে। কাজেই বড়জোর আরও ঘণ্টা দুয়েক লাগা উচিৎ ওখরে পৌঁছতে। তবে পাহাড়ি রাস্তায় সময়-দূরত্বের সম্পর্ক যে অনেক সময়েই সরল সমীকরণ মানে না সেটা আগেও দেখেছি, তাই এখানে বসে সময়ের হিসেব না কষাই শ্রেয়।

বৃষ্টিস্নাত ওখরে

আজ ওখরে পৌঁছতে যেহেতু সন্ধ্যে হয়ে যাবে, তাই আজ রাতে বিশেষ কোনও কাজ নেই বিশ্রাম নেওয়া এবং জিনিসপত্র গোছগাছ করা ছাড়া। ওখরেকে আমাদের এবারের ট্রেকের বেসক্যাম্প বলা চলে। আজ রাত কাটানো ছাড়াও আরও বার দুয়েক আমাদের পথ এই ওখরেকে ছুঁয়েই যাবে। কাজেই আমাদের রুকস্যাকের ওজন কমাতে বেশ কিছু জিনিসপত্র আমরা ওখরেতেই আপাতত রেখে যাব ঠিক করেছি। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই আমরা রওনা দেব গোরখের দিকে। গোরখে যেতে হলে রাস্তা বলতে যা বোঝায় সেটা ওখরে থেকে খানিকদূর গিয়ে শেষ হয়েছে একটা জঙ্গলের সামনে। সেখান থেকে জঙ্গলের পথ ধরে গোটাকয়েক টিলাকে টপকে পৌঁছনো যায় ছোট্ট গোরখে গ্রামে। এই জঙ্গলের রাস্তা ছাড়া গোরখে পৌঁছনোর আরেকটা রাস্তাও আছে, তবে সেটা ফালুট থেকে নামার পথে। আগেই বলেছি, ট্রেক হিসেবে একেবারেই সহজ শ্রেণীতে পড়ে এই গোরখের পথ, কিন্তু আমাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আবহাওয়া। শিলিগুড়ি ছাড়ার একটু পর থেকেই আকাশে মেঘ জমছিল, আর এখন আকাশের অবস্থা বেশ খারাপ। সিকিমের আবহাওয়া নিয়ে কোনও প্রত্যাশা রাখা উচিৎ নয় এটা ঠিকই, কিন্তু বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ট্রেক করতে কেই বা চায়। তাও

আবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। এখন যদি বরুণদেবের কৃপায় আজ রাতে একপশলা বৃষ্টি হয় তাহলে কাল একটু ঝকঝকে রোদ পাওয়া যেতে পারে। দেখা যাক কি আছে কপালে। এবার আবার রওনা হবার পালা। গন্তব্য ওখরে।

৩১শে মার্চ, দুপুর ২টো: গোরখেতে আমাদের হোমস্টের ঘরে বসে ডায়েরী লিখছি। দুপুরের খাওয়া সেরে সবাই এবার একটু বিশ্রাম নিতে ব্যস্ত। অবশ্য হোমস্টে বলতে চোখের সামনে যে ছবিটা ভেসে ওঠে, গোরখের এই ইডেন লজ তার ধারে কাছে দিয়েও যায় না। তবে খুব বিলাসিতার প্রত্যাশা না রাখলে কয়েকটা দিন দিব্যি স্বচ্ছন্দে কাটানো চলে। বাংলা-সিকিম সীমান্তের এই গোরখে গ্রাম হিসেবে খুবই ছোট। হাতেগোনা কয়েক ঘর মানুষের বাস যাদের মূল জীবিকা চাষবাস। গ্রামের এক পাশ দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে গোরখে খোলা বা গোরখে নদী, যার জল এখানকার মানুষ চাষের জমি থেকে গৃহস্থালি সব কাজেই ব্যবহার করে। তবে ইদানীং ট্রেকিং নিয়ে মানুষের উৎসাহ বাড়ায় আর সান্দাকফু-ফালুট ট্রেক রুটের মধ্যে থাকায় গোরখেতেও কয়েকটা হোমস্টে চালু হয়েছে যাদের মধ্যে একটা হল আমাদের এই ইডেন লজ। ইটের তৈরি গোরখে গ্রামের মূল রাস্তা থেকে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে বাঁহাতে দুটো ঘর নিয়ে হোমস্টের টিনের ছাদওয়ালা নিচু একতলা বাড়িটা। প্রথম ঘরটা একটা ডরমিটরি, যেটা আমাদের থাকার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আর অন্য ঘরটা এদের ব্যাক্তিগত। ডরমিটরির ভেতর দুদিকে, প্লাইউডের দেওয়াল ঘেঁসে, সব মিলিয়ে দশটা বিছানায় অতিথিদের শোবার ব্যাবস্থা, মাঝে একটা টেবিল আর মূল দরজার উল্টোদিকে, ঘরের অন্য প্রান্তে বাথরুম। মূল জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন গোরখেতে ইলেক্ট্রিসিটি যে নেই সেটা বলাই বাহুল্য। তবে সোলার লাইটের ব্যাবস্থা আছে মোটামুটি সব বাড়িতেই। আমাদের ঘরেরও ঠিক মাঝখানে ছাদ থেকে একটা সেরকমই আলো ঝোলানো, যদিও তার ঔজ্জ্বল্য নিতান্তই কাজ চালানোর মতন। ঘর থেকে বেরোলেই একটা উঠোন যার এক কোণে আরেকটা বাথরুমের বন্দোবস্ত। খাবার জায়গাটা আমাদের ঘরের ঠিক পেছনে একটা দোকানের লাগোয়া এক চিলতে উঠোনের ওপর। দোকানটাও সম্ভবত এদেরই এবং সেখানে যে সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায় সেটা এই খানিকক্ষণ আগেই আমরা বেশ নির্লজ্জের মতন চেয়ে চেয়ে খেয়ে এসেছি।

গোরখের পথে

গতকাল সোরেং থেকে বিকেল বেলা রওনা হবার কথা আগেই লিখেছি। মাঝে রাস্তা মেরামতের জন্য একটু দেরী হওয়া ছাড়া আর বিশেষ থামতে না হলেও ওখরে পৌঁছতে হয়ে গেল প্রায় রাত আটটা।

স্বাভাবিক ভাবেই ততক্ষণে দোকানপাট সব বন্ধ হবার মুখে, তাই মিংমা জির (আমাদের বাড়ীওয়ালা) হোটেলে তড়িঘড়ি চেক ইন করেই আমরা ছুটলাম রাতের খাবারের সন্ধানে। ওখরেতে ঠাণ্ডা বেশ জাঁকালো, তাই গরম গরম ম্যাগী আর কফি সহকারে ডিনারটা বেশ আরামদায়কই হয়েছিল। হোটেলে ফিরে একটু আড্ডা দিয়ে, মেঘের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে আসা জ্যোৎস্নামাখা ওখরের রাস্তায় এক চক্কর ঘুরে এসে যখন ঘুমোনোর কথা ভাবছি তখন হাতঘড়ির কাঁটা এগারোটা ছুঁইছুঁই। সারাদিনের ক্লান্তিতে রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, একবার মেঘ ডাকার শব্দে ঘুমটা ভাঙতে বুঝলাম বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তারপর যখন সকালে ঘুম ভাঙল তখন আবহাওয়া বেশ খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে গতকালের থেকে। ব্রেকফাস্ট সেরে, ন'টা নাগাদ যখন রওনা দিলাম গোরখের দিকে তখন রোদের আভাসও দেখা দিয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো, গতকাল অন্ধকার থাকায় লক্ষ্য করিনি, আজ দেখতে পেলাম ওখরে ঢোকার মুখেই দুটো মাঝারি সাইজের গাছে থোকা থোকা লাল রডোডেনড্রন। সব মিলিয়ে মন ভালো করে দিয়ে শুরু হল সিকিমে আমাদের প্রথম দিন। ওখরে ছেড়ে খানিকদূর গাড়িতে এসে একটা মোড়ের বাঁক ঘুরে যেখানে পিচ রাস্তা শেষ হয়েছে সেখান থেকে আমরা ঢুকলাম জঙ্গলের রাস্তায়। রাস্তা বলতে একটা পায়ে চলা, ঝরা পাতায় ঢাকা পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে জঙ্গলের বুক চিরে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে। অনেক চড়াই উৎরাই টপকে, গোটা দুয়েক পাহাড়ি ঝর্ণাকে সাবধানে পার করে সেই আলোছায়ার কাটাকুটি বেছানো পথ ধরে যখন আমরা গোরখে নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম তখন বেশ বেলা হয়েছে। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে সকাল থেকেই আবহাওয়া ক্রমশ ভালোর দিকে, নাহলে বৃষ্টির মধ্যে এই জঙ্গলের রাস্তায় হাঁটতে হলে দুর্গতির শেষ থাকতো না। জঙ্গলের রাস্তায় ঢোকার একটু পরেই আমাদের দলটা দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আমরা কয়েকজন যারা সামনের দলে ছিলাম তারা যখন নদীর ধারের ঘাস জমিতে খানিক বিশ্রাম করে, ছবিটবি তুলছি ততক্ষণে বাকিরাও এসে উপস্থিত। তারপর ছোট্ট একটা কাঠের সাঁকো দিয়ে নদী টপকে, বন দপ্তরের খাতায় নাম লিখিয়ে লজটা খুঁজে বের করতে বিশেষ সমস্যা হয়নি। গোরখের কাছেই একটা ছোট গ্রাম আছে, নাম সামান্দিন। এবার একবার সেখানে ঢুঁ মারতে পারলে মন্দ হয় না।

প্রবেশদ্বার, ভার্সেই স্যাংচুয়ারি

১লা এপ্রিল, সকাল ৮টা: আলোর সমস্যা থাকায় গতকাল রাতে আর ডায়েরী লেখার সুযোগ হয় নি, তাই আজ গোরখে ছেড়ে যাওয়ার আগে সেটা সেরে নি। কাল সামান্দিন থেকে ফিরতে ফিরতে বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছিল। কারণটা আর কিছুই নয়, ক্রিকেট। গোরখে থেকে মিনিট কুড়ির হাঁটা-পথের দূরত্বে সামান্দিন একটা ছবির মতন সাজানো ছোট্ট গ্রাম যার প্রায় সবটা জুড়েই চাষের জমি।

আমরা যখন সেরকমই একটা জমির ধারে বসে রোদ পোয়াচ্ছি সেই সময় দুজন স্থানীয় ছেলে ব্যাট-বল নিয়ে এসে হাজির। স্বভাবতই আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। খেলার উত্তেজনা এতটাই মাত্রা ছাড়িয়েছিল যে আশপাশের হোমস্টেতে যেসব ক্রিকেটপ্রেমী বাঙালি ট্যুরিস্ট ছিল তারাও একে একে এসে আমাদের দল ভারী করল। এরকম অবস্থায় সময়ের হিসেব রাখাটা নিতান্তই কঠিন। যাই হোক ফিরে এসে চা-পকোড়া সহ চাঁদের আলোতে ক্যাম্পফায়ার আর আড্ডাটা হল জমজমাট আর সেটা চলল একেবারে ডিনারের পর লেপমুড়ি দিয়ে ভূতের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত। এবার আমরা পাড়ি দেব ভার্সেই রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারির পথে। যেহেতু গোরখেতে কোনও সড়ক যোগাযোগ নেই, কাজেই আবার আমাদের জঙ্গলের পথ দিয়ে হেঁটে বড় রাস্তায় ফেরত গিয়ে গাড়িতে করে হিলি (Hilley) অবধি পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে স্যাংচুয়ারির মধ্যে দিয়ে হেঁটে ভার্সেই হয়ে আবার হিলিতে ফিরে আসতে ঘণ্টা চারেক লাগা উচিৎ। গোটা ট্যুরের মধ্যে আজই বলতে গেলে আসল ট্রেকের দিন তাই সকালে উঠে আকাশের মুখ ভার দেখে আমরা ঠিক করেছি একটু আগেভাগেই বেরিয়ে পড়বো। তারই তোড়জোড় চলছে।

গোলাপি রডোডেনড্রন

সন্ধ্যে ৭টা: দিন তিনেক আগে যখন কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম তখন ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাইনি এবারের এপ্রিল ফুলস ডে তে প্রকৃতি এভাবে আমাদের বোকা বানাবে। আর তার একটাই কারণ, সারাদিন কখনো ঝিরঝির আর কখনো মুষলধারায় পড়তে থাকা বৃষ্টি। ওখরেতে ফিরে, হোটেলের ঘরে বসে এখন যখন ডায়েরী লিখছি তখনও বাইরে অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে আর স্বভাবতই এতে ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে এক ধাক্কায় বেশ কয়েক ডিগ্রি। যাই হোক এবার ঘটনাগুলো বলি। সকালে গোরখে থেকে বেরোনোর সময়েই বলেছিলাম আকাশে মেঘ থাকার কথা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেঁটে জঙ্গল পার করে, বড় রাস্তায় এসে, গাড়ি করে হিলি অবধি মোটামুটি নির্বিঘ্নেই যখন পৌঁছেছি ততক্ষণে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সকলের সঙ্গেই ছাতা বা রেনকোট ছিল, তাই সেগুলোর ব্যবহার শুরু করে, ফরেস্ট অফিসের প্রয়োজনীয় সইসাবুদ সেরে দুপুর দুটো নাগাদ দুগ্গা বলে রওনা দিলাম ভার্সেই-এর দিকে। ভার্সেই-এর স্যাংচুয়ারি রডোডেনড্রন ছাড়াও লাল পাণ্ডার জন্য বিখ্যাত। তাই জঙ্গলের পথ দিয়ে হাঁটার সময় দুদিকে বাঁশ জাতীয় গাছের প্রাধান্যের মধ্যে চোখে পড়ছিল লাল, সাদা, গোলাপি রঙের ছোপের মতন রডোডেনড্রনের গাছগুলো। আসল বিপত্তিটা শুরু হল খানিকটা এগোনোর পর যখন বৃষ্টির বেগ ক্রমে বাড়তে শুরু করল। এমনিতেই ঝরা পাতায় ঢাকা কাঁচা রাস্তাতে অল্প বৃষ্টিতেই দ্রুত হাঁটা মুশকিল হচ্ছিল, বৃষ্টির বেগ বাড়ায় সেটা আরোই অসম্ভব হয়ে উঠল। উপায় না দেখে আমরা একটা টিনের শেডের নীচে একটু অপেক্ষা করা স্থির করলাম, কিন্তু তাতে

পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হলো না। এদিকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে ফেরার সময় সন্ধ্যে হয়ে যাবার আশঙ্কায় আবার শুরু হল ভার্সেইএর দিকে হাঁটা। পরে এই সিদ্ধান্তের জন্যে যথেষ্ট অনুতাপও হয়েছিল। যাই হোক, প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর যখন মনে হল আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়েছে ঠিক সেই সময় সকলকে চমকে দিয়ে শুরু হল শিলাবৃষ্টি। সৌভাগ্যবশত কাছেই আরেকটা ছোট ছাউনি ছিল, তার নীচে কোনরকমে দাঁড়িয়ে ভিজে যাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচাতে বাঁচাতেই দেখলাম কিভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আশেপাশের মাটি সাদা বরফকুচিতে ঢাকা পড়ে গেল। আরও বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর এবং নিজেদের ভাগ্যকে যথেচ্ছ গালিগালাজ করার পর শিলাবৃষ্টির প্রকোপ যখন একটু কমেছে তখন আমরা আবার রওনা দিলাম ভার্সেই এর দিকে। অন্য সময় হলে হয়ত ফেরার কথা আগে মনে হতো, কিন্তু এতরকম বাধা পেয়ে তখন মনে কেমন একটা জেদ এসে গেছিল ট্রেকটা সম্পূর্ণ করার। এদিকে শিলাবৃষ্টির কারণে কে যে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা বোঝা দুষ্কর আর নেটওয়ার্ক এর অভাবে মোবাইলগুলোও অকেজো। তাই বাকিদের জন্য একটা পথ নির্দেশ রেখে, আমরা সামনের দলের তিনজন এগিয়ে চললাম ভার্সেই এর দিকে। আরও প্রায় একঘণ্টা হেঁটে যখন আমরা শেষ পর্যন্ত ভার্সেই পৌঁছলাম, ততক্ষণে বৃষ্টি ভেজা জামাকাপড়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় রীতিমতো কাঁপুনি ধরতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে এটা দেখেও মনটাও খারাপ হয়ে গেল যে ভার্সেই আসার মূল কারণ রডোডেনড্রনের গাছগুলোতে ফুলের চিহ্নমাত্র নেই। আর আকাশের যা অবস্থা তাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যে সম্ভব নয় সেটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই ভার্সেই ফরেস্ট ক্যাম্পের কেয়ারটেকারের অনুরোধে এক কাপ করে চা খেয়ে, জুতো মোজাগুলো যতটা পারা যায় উনুনের আঁচে শুকিয়ে, আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। ফেরার পথে বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাওয়ায় আর অতটা অসুবিধে হয়নি, তাই সূর্য ডোবার আগেই আমরা আবার হিলি পৌঁছে যেতে পেরেছিলাম। তারপর গাড়ি করে ঘন্টাখানেক আগে ওখরে এসে পৌঁছেছি। এখন সকলেই দেখছি মোটামুটি মন খারাপ কাটিয়ে উঠে অনেকটাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে ট্রেকের অসম্পূর্ণতাকে। আর এটাই বোধহয় ট্রেকিং সবথেকে বেশী করে মানুষকে শেখায়, মেনে নেওয়া আর মানিয়ে চলা। কে বলতে পারে রডোডেনড্রন ট্রেকের এই ব্যর্থতা ভবিষ্যতের কোনও সফল ট্রেকের শুভ মহরৎ নয়??

পর্ব ২: সিঙ্ঘিক, উত্তর সিকিম

১৮ই মে, রাত ১০টা: কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার আশায় প্রায় মাসখানেক আগেই আমরা পাড়ি জমিয়েছিলাম সিকিমের দিকে, যদিও সে আশা যে কিভাবে অনেক চেষ্টা করেও পূর্ণ হয়নি সেটা আগেই লিখেছি, তবে এটা ভাবিনি যে এত তাড়াতাড়ি আরও একবার বেরিয়ে পড়ার সুযোগ পাবো। সময়, সুযোগ এবং টিকিট, এই তিনটেই যখন পাওয়া গেল তখন আরও একবার ভাগ্যপরীক্ষা করার লোভ সামলানো সত্যিই কঠিন। তাই আরও একবার আমাদের গন্তব্য সেই সিকিম। তবে এবার পশ্চিম নয় উত্তর, জায়গার নাম সিঙ্ঘিক। নাম শুনে অচেনা লাগা স্বাভাবিক, কারণ লেপচা উপজাতি অধ্যুষিত সিঙ্ঘিক সত্যিই এখনও সেই অর্থে ট্যুরিস্ট স্পট হয়ে ওঠেনি। আর সেরকম পরিচিত কোনও ট্রেক রুট না থাকায়, শুধুমাত্র সিঙ্ঘিকে বেড়াতে যাওয়া মানুষ সত্যিই হাতেগোনা। দর্শনীয় স্থান বলতে সিঙ্ঘিকে একটা প্রাচীন গুম্ফা ছাড়া আর বিশেষ কিছু

নেই, আর সত্যি বলতে এসব সাইট সিয়িং নিয়ে আমাদেরও যে খুব একটা উৎসাহ আছে এরকমও নয়। আমরা মূলত যাচ্ছি সিঙ্ঘিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ শিবালিক হিমালয়ের আরও কয়েকটি শৃঙ্গের যে চোখ ধাঁধানো প্যানোরমা দেখতে পাওয়া যায় তা চাক্ষুষ এবং অবশ্যই লেন্সবন্দি করার উদ্দেশ্যে। ট্রেক বলতে যা বোঝায়, আমাদের এবারের সিকিম ভ্রমণ একেবারেই সেরকম কিছু নয়, তাই এবার দিনসংখ্যাও কম, মাত্র দু'দিন আর আমাদের দলও মাত্র চারজনের।

কাল সকালে শিলিগুড়ি পৌঁছে আমাদের প্রথম কাজ হল শিলিগুড়ি থেকে মঙ্গন (উত্তর সিকিমের জেলা সদর) যাবার সিকিম সরকারের বাসটিকে পাকড়াও করা। এতে সময় আর টাকা দুটোই অনেকটা করে বাঁচে, আর বাসগুলো ভালো হওয়ায় ঘণ্টা ছয়েকের রাস্তায় দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে গল্প করতে করতে সন্ধ্যের মুখে পৌঁছে যাওয়া যায় মঙ্গন। সব মিলিয়ে বেশ আরামদায়ক জার্নি। তবে শিলিগুড়ি-মঙ্গন রুটে সারাদিনে বাস চলে একটিই, আর সেটাও শিলিগুড়ি ছাড়ে সকাল এগারোটা নাগাদ। কাজেই ট্রেন লেট থাকলে সময় মতন বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছনোটা একটা দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। তবে কোনও কারণে বাস না থাকলে বা মিস করলে তখন অবশ্য গাড়ি ভাড়া বা শাটল ছাড়া গতি নেই। দেখা যাক কি আছে এবার আমাদের কপালে।

সিঙ্ঘিকের বাসিন্দা লেপচা উপজাতি

১৯ই মে, রাত ৮টা: কিছুক্ষণ আগেই আমরা ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে সিঙ্ঘিকে এসে পৌঁছেছি। খুব তাড়াহুড়ো করে প্ল্যান করায় আর এই প্রাক-বর্ষায় ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হবার আশঙ্কা থাকায়, আমরা সেভাবে নির্দিষ্ট কোনও থাকার বন্দোবস্ত করে আসিনি। তবে অফ সিজন হওয়ায়, সিঙ্ঘিকে হোমস্টে খুঁজে পাওয়াটা যে খুব একটা মুশকিলের হবেনা সেটা আন্দাজ করেছিলাম। ট্যুরিস্টমহলে অপরিচিত হওয়াতে গোটা সিঙ্ঘিকে হোমস্টে বলতে দুটিই। একটি নতুন তৈরি হওয়া আমাদের এই লাজোমলা হোমস্টে, যেটা মঙ্গন থেকে সিঙ্ঘিক আসার রাস্তায় সামনেই পড়ে, আর অন্যটা এখানকার পুরোনো সিঙ্ঘিক বাংলো, যেটা মূল রাস্তা থেকে আরেকটু দূরে। লাজোমলা হোমস্টে থাকার জায়গা হিসেবে বেশ পরিপাটী। পাহাড়ি লতার ছাউনি দেওয়া মেন গেট দিয়ে ঢুকেই, ডাইনে একটা ছোট্ট লনের পাশে হোমস্টের তিব্বতি মালিক ও তার পরিবারের ঘর। মূল হোমস্টেতে ঢুকে বাঁয়ে রিসেপশন আর একটা বেশ বড় ডাইনিং রুম। ডাইনিং এর পাশেই বাথরুম আর তার পাশে দুটো ঘর অতিথিদের জন্যে। এছাড়াও দোতলায় আরও দুটো ঘরেও থাকা চলে। তবে এখন সে দুটিই অন্য একটি দলের দখলে তাই আমাদের একতলার একটি ঘর পেয়েই খুশি থাকতে হল। চারজনের জন্যে যথেষ্ট বড় ঘর, দুই দেওয়ালে থাকা বড় বড় কাঁচের জানলা দিয়ে এখন

অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও আশা করা যায় সকালে আশেপাশের পাহাড়ের শোভা ঘরে বসেই দেখা যাবে। মোটের ওপর একদিনের থাকার জন্যে যথেষ্ট ভাল বন্দোবস্ত। কিন্তু আজ সকাল থেকেই যেভাবে একের পর এক ঘটনা হয়ে চলেছে তাতে এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা সে নিয়ে আমার মনে অন্তত যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এবারের সিকিম যাত্রার শুরু থেকেই বিপত্তি। যাকে বলে গোড়ায় গণ্ডগোল। প্রথমত আবারও সেই ট্রেন লেট, এবং আমাদের চারজনের সমবেত প্রার্থনা নস্যাৎ করে প্রায় এক ঘণ্টা লেট। কাজেই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে ব্যাগপত্র সমেত আমরা যে গতিতে দৌড়ে, লোকজনের সঙ্গে ধাক্কা এড়িয়ে, সিকিম বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা হলাম সেটা দেখলে নিঃসন্দেহে অনেক পেশাদার ফুটবলারই ঈর্ষা করতেন। কিন্তু আসল গণ্ডগোলটা বোঝা গেল বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে। ঘড়ির কাঁটা এগারোটা টপকে গেলেও বাসের দেখা নেই দেখে টিকিট কাউন্টারের ভদ্রলোককে জিগ্যেস করে পাওয়া গেল এক নিপাট নিরীহ ও ভাবলেশহীন উত্তর "বাস নেহি হ্যায়"। শুনে আমাদের তো প্রায় আঁতকে ওঠার মতন অবস্থা। এরপর তাঁকে যত প্রশ্নই করা হল বাস সংক্রান্ত, তাতে প্রত্যেকবারই একটাই উত্তর পাওয়া গেল, "বোলা না, বাস নেহি হ্যায়"। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আমরা ছুটলাম শাটলের খোঁজে। মঙ্গন যাওয়ার লোক এমনিতেই কম, আর তার ওপর বেলা হয়ে যাওয়ায় আরোই কেউ রাজি হল না বুকিং ছাড়া যেতে। অগত্যা উপায় না দেখে আমরা উঠে পড়লাম শিলিগুড়ি থেকে রংপো যাওয়ার শাটলে। রংপো বাংলা-সিকিম সীমান্তে, পূর্ব সিকিমের একটা ছোট্ট শহর, যাকে গেটওয়ে অফ সিকিম বলা চলে। রংপো থেকে সিকিমের প্রায় সর্বত্র যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যায়। কাজেই সেরকম শাটল পাওয়া গেলে, ব্রেক জার্নি করেও রংপো থেকে সিংতাম হয়ে মঙ্গন পৌঁছে যাওয়া যাবে একটু রাত হলেও। কিন্তু সেবক পৌঁছতেই আবার এক নতুন বিপদ এসে জুটল। সাধারণত প্রচুর গাড়ি, বাস ও ট্রাক চলাচল করে বলে, NH 10 এর এই অংশে ছোটখাটো জ্যাম লেগেই থাকে, আর সেটা কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাভাবিকও হয়ে যায়। কিন্তু সেবক মোড়ের কিছুটা আগে আমাদের গাড়ি সেই যে দাঁড়ালো তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেলেও যখন জ্যাম স্বাভাবিক হল না তখন আমাদের মধ্যে বেশ একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সিঙ্ঘিক পৌঁছনো নিয়ে। ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়েছিলেন সরেজমিনে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে। তিনি ফিরে এসে জানালেন সামনে রাস্তায় ধস মেরামতের কাজ চলছে এবং সেটা শেষ করে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হতে আরও বেশ কিছুটা সময় লাগবে। অগত্যা

হোমস্টের পিছনে হিমালয়ের প্যানোরমা

সময়ের সদব্যাবহার করার উদ্দেশ্যে আমরা সকলে নেমে, পায়ে হেঁটে সেবক মোড়ে পৌঁছে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘন্টাখানেক পরে আবার যখন গাড়ির দিকে ফিরছি, ততক্ষণে সবেমাত্র গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে। এরপর সিংতাম হয়ে মঙ্গন পৌঁছতেই প্রায় সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেল। তারপর অবশ্য সিঙ্ঘিকে এসে হোমস্টে খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। যাই হোক, এবার ডিনার সেরে লম্বা ঘুম, সারাদিনের ধকলে সকলেই বেশ ক্লান্ত। কাল ভোরে একটাই কাজ, মিশন কাঞ্চনজঙ্ঘা।

২০শে মে, সকাল ৯টা: যাবতীয় আশঙ্কার মেঘ কাটিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন পেয়ে আমাদের সিঙ্ঘিক আসা সার্থক হল। যদিও এখানে সে আর আমাদের চেনা স্লিপিং বুদ্ধ নয়। একেবারেই অচেনা এক রূপ, তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা তো কাঞ্চনজঙ্ঘাই, তাই তার ব্যাক্তিত্বে তাকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। আর শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন, একেবারে বাঁয়ে পান্ডিম থেকে ডানদিকে সিম্ভো টুইন্স পর্যন্ত গোটা কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জটাই আজ ধরা দিল আমাদের লেন্সে। সিঙ্ঘিক গ্রামটার পশ্চিমদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা থাকায়, সূর্যোদয়ের বেশ সুন্দর মুহূর্ত পাওয়া যায়। তারই লোভে আমরা ভোর হবার আগেই উঠে, আকাশ পরিষ্কার দেখে, ক্যামেরা আর টর্চ নিয়ে রওনা হলাম ভিউ পয়েন্ট খোঁজার লক্ষ্যে। সাধারণত, এই সমস্ত পাহাড়ি গ্রামে সবসময়ই একটা ভিউ পয়েন্ট থাকে যেখান থেকে গোটা রেঞ্জটাই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। যদিও অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সিঙ্ঘিকে সেরকম কোনও ভিউ পয়েন্ট আমরা দেখতে পেলাম না। কাজেই নিজেরাই ভিউ পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আমরা রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ওপরে, পাহাড়ের ঢালে একটা বেশ বড় অফিসগোছের বাড়ির উঠোনে জড়ো হলাম। সূর্যোদয়ের জন্যে অবশ্য বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। আবছা একটা আলোতে অনেকক্ষণ থেকেই বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তার আশেপাশের বরফে ঢাকা শৃঙ্গগুলোকে, এবার সূর্য আমাদের পিছনের পাহাড়ের ফাঁক থেকে উঁকি দিতেই শুরু হল সেই চিরপরিচিত রঙের খেলা। একে একে রঙিন হয়ে উঠলো প্রথমে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তারপর উচ্চতার ক্রমানুসারে কাবরু, তালুং, পান্ডিম ও সিম্ভো টুইন্স। এ দৃশ্য যতবারই দেখি, সেই একইরকম ভাবে মুগ্ধ হই। আর হিমালয়ের স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যে আপনা থেকেই মন তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। অবশ্য এই দৃষ্টিসুখ খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। শৃঙ্গগুলোর সোনালি রং ফিকে হতে শুরু করতেই পাতলা মেঘের আস্তরণ পর্দার মতন এসে ক্রমশ অধরা করে দিতে লাগল কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্য শৃঙ্গগুলোকে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তার সামনে জেমু শৃঙ্গ

আমরা যখন ফিরতি পথ ধরে হোমস্টের দিকে নামছি, ততক্ষণে পরতে পরতে মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে গোটা কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জকে। আর এখন প্রায় গোটা সিঙ্ঘিক গ্রামটাই ঢেকে আছে একটা হাল্কা মেঘের চাদরে। দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন যে একটু আগেই এই সিঙ্ঘিক থেকেই আমরা সাক্ষী থেকেছি এক অবিস্মরণীয় সূর্যোদয়ের। এই অনিশ্চয়তাই বোধহয় পাহাড়ের মূল আকর্ষণ। সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে একটিবার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর আকুতি, সাফল্যের আনন্দ, ব্যর্থতার আক্ষেপ, আবার ছুটে চলা পরের লক্ষ্যের দিকে এই সব মিলিয়েই হিমালয় আজও এক দুর্নিবার আকর্ষণ পাহাড়প্রেমীদের কাছে।

সূর্যোদয়ের সময় সিঙ্ঘিক থেকে তোলা কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ। বাঁদিক থেকে পান্ডিম, কাবরু, তালুং, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও সিঙ্গো টুইন্স।

Senior Research Scientist (Physics Division)

Prophecy Sensorlytics (India) Pvt. Ltd. Salt Lake, Kolkata.

Dark Matter: Why does it matter?

- Dr. Dibyendu Nanda, Ex Student.

Let us begin with the old age question, "What is our universe made of?" In a real night sky, if you see through a telescope, you can see a lot of stars, planets, or even some other galaxies. All these things are made up of electron, protons, neutrons. But, is that all? The answer is "No"! In 1933, Fritz Zwicky, a Swiss astronomer, wanted to estimate how much matter is there in a galaxy cluster, namely coma cluster. How can we determine the total mass of any galaxy? Well, there are many different ways to do that. He estimated the mass of this galaxy cluster, based on the light they emitted. If one can measure how much light is coming, then one can estimate the total number of galaxies present in that cluster. As we know the typical mass of a galaxy, we can find out the total mass by multiplying the number of galaxies with the mass of a single galaxy. He found that this cluster has 800 galaxies in it, and the typical mass of a galaxy is $10^9\ M_{\odot}$. However, being a good scientist, he wanted to cross-check his result and used a different technique to measure the same quantity. We know that gravity depends on mass. So the total gravitation potential of the coma cluster depends on the total mass of the cluster. He assumed that the cluster is in equilibrium system and used the **Virial theorem**, which allows us to relate the kinetic energy of a particle propagating in a gravitational potential. Mathematically, one can write,

$$K.E. = -\frac{1}{2}\,P.E.$$

Without going into the mathematical details, one can easily understand that the potential energy (P.E.) will depend on the total mass of the system. Now, if you know the velocity of the particle, you can find out the kinetic energy and calculate the total mass of the cluster by using the above equation. There are ways to find out the typical velocities of a star in the cluster, and hence one can find out the total mass of the cluster. Interestingly, he found out a discrepancy between the two results. The result from the second method (M_2) came out to be 500 times greater than the result from the first method (M_1). This was back in 1933. Modern calculation shows that actually M_2 = 50 M_1. Zwicky got the distance wrong in his calculation. An important point to note is that the first method relies on the luminous matter (which emits light), whereas the second one completely depends on the gravitational potential. So, what does it mean? May be we are missing something in our first method; may be there is something in our universe which does not interact with light and hence not contributing in the first method. He named this "something" as Dark Matter.

The idea of dark matter was largely ignored until the 1970s when astronomer Vera Rubin saw something that gave her the same thought. She was trying to study the velocity of stars moving around the center of our neighboring Andromeda galaxy. She expected that the stars at the edge of the galaxy would move more slowly than those at its axis. The reason is that the stars closest to the bright and, therefore, a massive cluster of stars in the center would feel the most gravitational pull. However, she found something else. The stars on the margins of the galaxy moved just as quickly as those in the middle. This would make sense if the disc of visible stars were surrounded by an even larger halo made of something we couldn't see: something like dark matter.

There exist many other observational evidences which suggest the same thing. In fact, according to the recent data, almost 85% of the universe's matter content consists of dark matter. Is it not strange? Everything we can see with telescopes makes up just about 15% of the total mass in the universe. Most of the material of our universe is made of something entirely different than you and me. The interesting thing is that dark matter is all around us. Without it, the universe as we know it would not exist. Whatever structures in the universe like stars, planet, galaxies, and clusters of galaxies, nothing would form without dark matter. In short, we could not exist without it. So, it is really important to know what it is. You will be surprised by knowing the fact that dark matter particles are probably going through our bodies right now.

You can ask, then why can't we detect it? As you understand, it isn't very easy to detect something without knowing anything about it. To detect dark matter, we have to know how it interacts with our known particles. We can study something unknown by looking at the imprints of it in the known world. Unfortunately, we don't know how dark matter interacts. We don't know what the exact mass of the dark matter particle is. We don't know what kind of particle it is: scalar, fermion or a vector boson. These are the open questions of particle physics. Scientists are looking for answers to these questions. There are many great ideas, and based on those ideas, different experiments are running in different parts of the earth, to find out the answers to these unsolved puzzles.

How can we detect dark matter? Well, there are three different ways to detect it. As dark matter particles passing through the earth, there is a finite probability that dark matter particles can come and hit a target material. I have already mentioned that dark matter has almost negligible interactions (if it interacts at all) with the visible particles, we need to design some highly sensitive experimental set-up. Scientists have built some underground experiments to avoid all kinds of background and to maximize the probability of detection. We are also trying to produce dark matter in the proton-proton collider at large hadron collider (LHC) just like we detected Higgs boson in 2012. We can also get some information about dark matter by detecting photons coming from different directions in the sky, known as indirect detection.

However, so far, none of those mentioned above experiments gave a positive signal. **Hope is essential and we are hopeful!** Despite all these negative results, we hope to see the so-called dark matter in coming future.

Postdoctoral Researcher, School of Physics,

Korea Institute for Advanced Study, Seoul 02455, South Korea.

- Sayak Ghosh, Ex Student.

Universal Responsibility

- Bipul Mandal, Ex Guest Lecturer

Having known about the truth of ever increasing entropy we, human beings, the most intelligent amongst all living beings can do best for deaccelerating the pace of ongoing mixtupness. It is natural and theoretically approved of having more and more randomness in nature which also includes our life and also decides our future. It is not that only usable energy is decreasing but if we look closely we can definitely find out that our thinking, feeling, psychologies are also getting distorted from that form which they were inherited from the superpower at the time of creation of universe in the moments of Big Bang.

Now on the journey from Big Bang to present moment human have acquired knowledge of past happenings, present doings and future plans. But it is not true universally for all people. Many are illeterate, some are selfish to overlook the situation. Here comes the responsibility of us being blessed with behavior changing tactics called education. We have to come forward as problem solvers that can be trivial as household problems or may be massive as holding the sustainability of endangered universe. Enhancing self knowledge and imparting it to others is the basic. The gateways are already established in form of schools, colleges, universities, social awareness programmes and so on. Habits starting from making a stop at unnecessary usage of energy in our homes to creation of laws in support of greenary should be inculcated together. We have many better plans available for sustained living but still we harm our environment and our educated soul too. It is upon us to take the universal responsibility as of our own responsibility.

Assistant Teacher (Physical Science),

Dangram IC High School, South Dinajpur.

লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ও নোবেল পুরষ্কারের গল্প

- ডঃ অংশুমান নন্দী, সহকারী অধ্যাপক

একটি ব্যাটারি বা তড়িৎকোষ প্রধানত তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত- অ্যানোড, ক্যাথোড ও তড়িৎবিশ্লেষ্য। একটি সাধারণ পেন্সিল ব্যাটারির ক্ষেত্রে, মাঝের দন্ডটি, যেটি +/- দিকচিহ্নিত করে, তার চারিপাশের অংশটি হয় ধনাত্মক ক্যাথোড। একে ঘিরে থাকে তড়িৎবিশ্লেষ্য, তার চারিপাশে থাকে ঋণাত্মক অ্যানোড। একটি ব্যাটারিকে যখন কোনো লোড, যেমন টর্চ বা ঘড়িতে লাগানো হয়, তখন ব্যাটারির মধ্যে দিয়ে আয়ন ও বাইরে তারের মাধ্যমে ইলেকট্রন পরিবহন ঘটে থাকে। ঋণাত্মক অ্যানোড '-' চিহ্নিত দিকের মাধ্যমে বহিস্থ লোডের মধ্যে ইলেকট্রন ত্যাগ করে, ধনাত্মক ক্যাথোড বহিস্থ লোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে। তড়িৎ বিশ্লেষ্য এর কাজ হল ক্যাথোড ও অ্যানোড এর মধ্যে আয়নের আদান-প্রদান ঘটানো। তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও অ্যানোড ক্যাথোড এর মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রধানত দুটি কাজ করে- একটি অংশ অ্যানোড ও ক্যাথোড এর মধ্যে ব্যাটারির ভিতর দিয়ে আয়ন পরিবহন করে ও অন্য অংশ অ্যানোড ও ক্যাথোড এর মধ্যে ব্যাটারির বাইরে দিয়ে ইলেকট্রন বা তড়িৎ পরিবহন করে। একটি রিচার্জেবল ব্যাটারির ক্ষেত্রে এই রাসায়নিক ক্রিয়া উভমুখী অর্থাৎ ব্যাটারি চার্জ করার সময় বিপরীত পথে আয়ন ও ইলেকট্রন পরিবহন হয়।

যে ব্যাটারির অ্যানোডটি অত্যন্ত হালকা লিথিয়াম ধাতুর কোন যৌগ দ্বারা তৈরি তাদের লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি বলা হয়। এগুলির তড়িৎ বিশ্লেষ্যটি কঠিন জৈব যৌগ এবং ক্যাথোডটি গ্রাফাইট বা কার্বন দ্বারা নির্মিত। ব্যাটারিগুলির আকার চ্যাপ্টা। বর্তমানে স্মার্টফোনের ব্যাটারি হিসেবে এগুলি বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও এগুলি বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক্স-সামগ্রী, মিলিটারি ও ইলেকট্রিক গাড়িতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যাটারির উন্নতি সাধনের কাজের জন্য ২০১৯ সালে রসায়ন এ নোবেল পুরস্কার পেলেন আমেরিকার জে. বি. গুডএনাফ ও স্ট্যানলি হুইটিংহ্যাম এবং জাপানের আকিরা ইয়শিনো নামক বিজ্ঞানী ত্রয়। এই ধরনের ব্যাটারি গুলিতে ডিসচার্জিং এর সময় অর্থাৎ যন্ত্রগুলি ব্যবহার করার সময় লিথিয়াম আয়ন ঋনাত্মক তড়িৎদ্বার থেকে তড়িৎ বিশ্লেষের মাধ্যমে ধনাত্মক তড়িৎদ্বার এর দিকে যায়। চার্জিং এর সময় অর্থাৎ বাইরের তড়িৎ উৎস যেমন প্লাগ পয়েন্টে যুক্ত থাকাকালীন লিথিয়াম আয়ন বিপরীত পথে পরিবাহিত হয়। প্রথম দিকে ব্যাটারি গুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। ভুল চার্জিং এর জন্য ব্যাটারি গুলিতে আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত যেমনটি স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট 7 এ দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে লিথিয়াম পলিমার জেল ধরনের জৈব যৌগ তড়িৎবিশ্লেষ্য হিসেবে ব্যবহার করে এই সম্ভাবনা অনেকটাই এড়ানো গেছে। ১৯৬০ সালে ইউরোপে বিজ্ঞানীরা প্রথম রিচার্জেবল ব্যাটারিতে লিথিয়ামের কার্যকারিতার উল্লেখ করেন। ১৯৭০ সালে আমেরিকায় খনিজ তেলের হঠাৎ সঙ্কটে বিজ্ঞানীরা বিকল্প শক্তির উৎসের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তি সহজলভ্য বিকল্প শক্তি হলেও

এগুলির অত্যধিক প্রকৃতি নির্ভরতা এগুলির ব্যবহারিক জীবনে কার্যকারিতা অনেকটাই কম করে দেয়। রিচার্জেবল ব্যাটারির প্রয়োজনীয়তা এইজন্য অনেকটাই বেশি হয়ে দেখা দেয়। রিচার্জ করা যায়না এরকম লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার শুরু হয়ে গেলেও রিচার্জেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি তখনো অপ্রতুল। এসময় আমেরিকার এক্সন মোবাইল কর্পোরেশন স্ট্যানলি হুইটিংহ্যাম নামক বিজ্ঞানী কে (নোবেল প্রাপক, ২০১৯) এই ধরনের ব্যাটারির উন্নতি সাধনের দায়িত্ব দেয়। হুইটিংহ্যাম ১৯৭৬ সালে লিথিয়াম টাইটেনিয়াম ডাই সালফাইড ব্যবহার করে সাফল্যের কথা প্রকাশ করেন। যদিও এই ব্যাটারি পরে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনার জন্য বাতিল হয়ে যায়। এই সময় জে. বি. গুডএনাফ (নোবেল প্রাপক, ২০১৯) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তে গবেষণা করে লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড ও লিথিয়াম নিকেল অক্সাইড ব্যবহার করে অনেক উন্নততর রিচার্জেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি বানিয়ে ফেলেন। এই যৌগ দুটির ব্যবহারে প্রভাবিত হয়ে জাপানের আসাহি কাসেই কর্পোরেশনের আকিরা ইয়শিনো (নোবেল প্রাপক, ২০১৯) ১৯৮৩ সালে লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড ক্যাথোড ও গ্রাফাইট অ্যানোড ব্যবহার করে পৃথিবীর প্রথম ব্যবহারযোগ্য রিচার্জেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি বানিয়ে ফেলেন যা সোনি কর্পোরেশন দ্বারা নির্মিত পৃথিবীর প্রথম বহনযোগ্য মোবাইল ফোন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ২০১৯ এ নোবেল জয়ী এই তিন বিজ্ঞানীর কাজ এবং পৃথিবীজুড়ে আজও চলমান গবেষণার জন্য লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির আকার ও আয়তন এখন আরো কমেছে, এর দাম ও বিপদ দুই কমেছে এবং এর কার্যকারিতার প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হলো আজকের দিনে এই ব্যাটারির বিপুল চাহিদা ও ব্যবহার।

আমাদেরই বেলতলা যে,
ন্যাড়া সেথা খেলতে আসে।

- ডঃ অমিতাভ পাল, প্রাক্তন অধ্যাপক

শিক্ষক সংসদ আয়োজিত পিকনিকে গিয়েছিলাম। অনেক নবাগত শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে পরিচয় হল। তাঁদেরই একজন আমায় দেখে সবিস্ময়ে বললেন "আপনিই সেই ফিজিক্স বইয়ের লেখক। আমি সে বই পড়েছি।" শুনে তো আমার আনন্দে মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা, কারণ আমার বইয়ের প্রকাশক প্রায়ই আমাকে মনে করিয়ে দেন – "ছায়া প্রকাশনীর বই বাজারে কাটে আর আপনার বই পোকায় কাটে"। এই অবস্থায় একজন জলজ্যান্ত পাঠিকার দর্শন পেয়ে আমি যাকে বলে "অভিভূত"। উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইলাম বইটা কেমন। উত্তরে তিনি বললেন "কি ভয়ানক!" আমি বললাম "বইটা ভয়ানক?" উনি বললেন "শুধু তাই নয়, ফিজিক্স সাবজেক্টাই বড় ভয়ানক। তাইতো আমি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে আর ফিজিক্স পড়িনি। ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করে এখন ইংরেজির শিক্ষিকা হয়েছি।" একথা শুনে আমার চতুর্দিকে একাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা সমস্বরে বলে উঠলেন "বটেই তো ফিজিক্স কেউ দু'বার পড়ে, আমরাও হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে আর ফিজিক্স রাখিনি।" এনারা কেউ বায়ো সায়েন্সের (বটানি, জুলজি ইত্যাদি) কেউ ইকোসায়েন্সের (ইকোনমিক্স, স্ট্যাটিসটিকস ইত্যাদি) শিক্ষক-শিক্ষিকা। সকলেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন ফিজিক্স হল বেলতলা, সেখানে কেউ দু'বার যায় না। একবারই যথেষ্ট। এই সিদ্ধান্ত বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত ফিজিক্স টিচাররাও ক্ষীণভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁরা স্নাতক স্তরে ফিজিক্স এর সিলেবাস থেকে একটা অংশ বাদ দিয়েছেন - কারণ ঐ বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিকে পড়ানো হয়; এবং ঐ বিষয়টি একবার পাঠই যথেষ্ট; যেমন "বেলতলা"য় একবার যাওয়াই যথেষ্ট। ফিজিক্স এর সেই বেলতলা হল জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান বা Geometrical Optics. বড় দাগা পেয়ে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের আলোচনা ছেড়েছি, তাই সিলেবাস বহির্ভূত এই বেলতলায় আমি যাবই, বরং চেষ্টা করব আমার ন্যাড়া মাথায় যাতে বেল না পড়ে।

জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞানের দু'টি মৌলিক প্রক্রিয়া হ'ল আলোক রশ্মির প্রতিফলন (Reflection) এবং প্রতিসরণ (Refraction)। প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের ফলে আলোর গতির অভিমুখ পরিবর্তন হয় বা আলোকরশ্মির বিচ্যুতি (Deviation) ঘটে। এর ফলে প্রতিবিম্ব (সদ্ বা অসদ্) গঠন হয়। প্রতিফলন বা প্রতিসরণ বক্রতলে হলে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ অভিসারী (Converging) বা অপসারী (Diverging) রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয়। প্রতিফলক বা প্রতিসারকের অভিসারী ক্ষমতা (Converging Power) কেই তার ক্ষমতা বা Power বলা হয়। অপসারী ক্ষমতাকে ঋণাত্মক ক্ষমতা ধরা হয়, যেমন কোনো লেন্সের ক্ষমতা +2 Dioptre হলে লেন্সটি অভিসারী আবার কোনো লেন্সের ক্ষমতা -3 Dioptre হলে লেন্সটি অপসারী। ওই অপসারী লেন্সের অপসারী ক্ষমতা 3 একক। যেহেতু লেন্সের ক্ষমতা বলতে অভিসারী ক্ষমতাকেই

বোঝায়; তাই 3 একক অপসারী ক্ষমতা বিশিষ্ট লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা হলো -3 Dioptre. প্রতিফলক বা প্রতিসারকের ক্ষমতা নির্ভর করে আলোর চলাচল মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক এবং প্রতিফলন বা প্রতিসারক তলের বক্রতা ব্যাসার্ধের উপরে। প্রতিফলনের বেলায় আলোকরশ্মি একটি মাধ্যমে চলাচল করে। ঐ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক 'μ'এবং প্রতিফলকের বক্রতা ব্যাসার্ধ 'R' হলে প্রতিফলকের ক্ষমতা $P = {}^{2\mu}/_{R}$

আবার প্রতিসরণ যেহেতু দু'ই মাধ্যমের মধ্যে হয়; তাই প্রতিসারক তলের ক্ষমতা

$P_{refraction} = {}^{(\mu_2 - \mu_1)}/_{R}$. বলাবাহুল্য μ_1 এবং μ_2 প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক।

আলোকিত বস্তুর এবং উহার প্রতিবিম্বের দূরত্ব সব সময় মাপা হয় প্রতিফলক বা প্রতিসারকের মেরু (Pole) থেকে এবং অক্ষ বরাবর, এবং দূরত্বের চিহ্ন (Sign) নির্ণয় করা হয় বস্তু বা প্রতিবিম্বর চরিত্র বিচার করে। বস্তু বা প্রতিবিম্ব যেই হোক না কেন সে যদি ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকে অর্থাৎ সে যদি সদ্ (Real) হয় তাহ'লে তার দূরত্ব ধনাত্মক, আর সে যদি ফেরার হয় অর্থাৎ অসদ্ (পাঠভেদে অসৎ বা Dishonest) হয় তবে তার দূরত্ব ঋণাত্মক হয়। সকল রকম একক প্রতিফলন বা একক প্রতিসরণের জন্য বস্তুদূরত্ব u, প্রতিবিম্ব দূরত্ব v এবং প্রতিফলক বা প্রতিসারকের ক্ষমতা P এর সম্পর্ক

$$\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = P$$

এই সম্পর্কটাই আমাদের বেলতলার একমাত্র বেলগাছ। এ'টিকে সাবধানে নাড়াচাড়া (deal) করলে কোন বেল পড়বে না। সাধারণ পুস্তকে (যেগুলি বাজারে কাটে) বেলতলায় অনেক গাছ বসানো হয়।

যেমন 1) সমতলে প্রতিফলনের জন্য $u = v$

2) বক্রতলে প্রতিফলনের জন্য $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{r}$

3) সমতলে প্রতিসরণের জন্য প্রকৃত গভীরতা (u)/ আপাত গভীরতা (v) = ${}^{2}\mu_1 = \mu_1/\mu_2$

= দ্বিতীয় মাধ্যমের তুলনায় প্রথম মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক।

4) বক্রতলে প্রতিসরণের জন্য $\frac{\mu_2}{v} - \frac{\mu_1}{u} = \frac{(\mu_2 - \mu_1)}{R}$

5) লেন্সে প্রতিসরণের জন্য $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_1}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$

ন্যাড়ার মাথায় বেল

উপরের পাঁচটি সুপ্রতিষ্ঠিত বেলগাছের মধ্যে (1) নং ও (3) নং গাছে $v = u$, $v = \frac{\mu_2}{\mu_1}u$ প্রতিবিম্বের চরিত্র (সদাসদ্) বিষয়ে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। রশ্মি অনুগমন (Ray tracing) করে প্রতিবিম্বকে অসদ্ প্রতিপন্ন করা হয়।

আর বাদ বাকি তিনটে গাছে (2), (4), (5) বস্তুর প্রকৃতি এবং অবস্থান থেকে u এর মান ও চিহ্ন সঠিকভাবে নির্ণীত করে গাছ থেকে v এর মান এবং চিহ্ন দুটিই নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ প্রতিবিম্বের অবস্থান এবং চরিত্র নির্ণয় করা যায়। আগের বাক্যে আমি 'চিহ্ন' শব্দটা দু'বার ব্যবহার করেছি। এই 'চিহ্ন' শব্দটাই সময় বিশেষে 'বেল' হয়ে বাচ্চাদের (ছাত্রদের) মাথায় পড়ে।

ধরা যাক প্রতিফলক বা প্রতিসারক তল থেকে 10 সেমি লম্ব দূরত্বে আলোকীয় বস্তু আছে। এক্ষেত্রে u=10 সেমি। এখন এর মান + 10 সেমি না -10 সেমি সেটা নির্ণয় করতে চিহ্নের (+ অথবা -) নিয়ম (sign convention) প্রয়োগ করতে হবে। এই চিহ্নের নিয়ম নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

প্রথমে ঋষি নিউটনের কথাই বলি। নিউটন বললেন "মাপতে চাও, তো মেরুতে গিয়ে দাঁড়াও, তারপর আলো যে দিকে যাচ্ছে তার উল্টো মুখে দাঁড়াও, এবার সমুখ বরাবর যা মাপবে তাই ধনাত্মক আর পিছন বরাবর যা মাপবে তাই ঋণাত্মক।" এরপর পাদ্রী ভাসত্রেতাঁ (Verstretan) বললেন "একটা graph paper নিয়ে আয়, লেন্সটাকে origin এ রাখ। Along +X-axis যা মাপবি তাই +ve আর along –X-axis যা মাপবি তাই –ve. তবে চেষ্টা করিস object টা যেন +X এর দিকে থাকে।" (উপরের বাক্যটা যদিও কাল্পনিক তবুও এ বিষয়ে দুটি কথা উল্লেখযোগ্য (1) Father Verstraten মাঝে মাঝে দু-একটা বাংলা কথা বলতেন। (2) উনার পড়ানোর ভঙ্গিটা এ রকমই ছিল।

পরবর্তীকালে Resnik, Halliday ইত্যাদি লেখক নিউটনের নিয়মেই থাকতে বলেন। তবে এঁরা বলেন "মেরুতে যাও, তবে উল্টো মুখো দাঁড়ানোর কোন দরকার নেই। আলো যে দিকে যাচ্ছে সে'দিকেই মুখ করে দাঁড়াও, তারপর নিউটন যা বলেছেন তাই করো।"

পাঠক (অথবা পাঠিকা) বিবেচনা করুন কখন বাচ্চারা u=10 সেমি মেপে বসে আছে এখন সেটা +10 সেমি না -10 সেমি তাই ঠিক করতেই গলদঘর্ম। প্রথমত কার প্রশ্ন নেবে (দাদাগিরি !!) ঋষির, পাদ্রীর না লেখকের। তারপর তাঁর নির্দেশ অনুসারে সম্মুখ অথবা Back gear হাঁটো ইত্যাদি। এইসব বেলের আক্রমণে পড়ে বাচ্চারা বেলতলা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে আর যেতে চায় না। সেইজন্য আমি এক বৃক্ষীয় বেলতলা বা One tree Beltola প্রতিষ্ঠা করেছি

$$\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = P$$

এখানেও একটা চিহ্নের নিয়ম আছে বৈকি, কিন্তু তা অতি সরল নিয়ম। তুমি বস্তু বা প্রতিবিম্ব যেই হও, যদি সদ্ (Real !) হও তা হলে ধনাত্মক অর্থাৎ +ve আর যদি অসদ্ (Virtual) হও তাহলে –ve । ধরা যাক বস্তু প্রতিফলক থেকে 10 সেমি লম্ব দূরত্বে আছে। যদি বস্তু সদ্ হয় তাহলে u= +10 সেমি। তেমনই প্রতিবিম্ব 15 সেমি দূরত্বে থেকে যদি সদ্ থাকে তাহলে v=+15 সেমি। যদি অসদ্ হয়ে যায় তাহলে v=-15 সেমি। সুতরাং সৎ পথে চললে $\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = P$ এই বেল গাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা নেই।

বিল্বফল

উপরোক্ত বেল গাছ থেকে আমরা যেসব ফল পেতে পারি তাদের একে একে হাজির করছি

বিল্বফল (1) সমতলে প্রতিফলনের ফল

আগেই বলেছি প্রতিফলনের বেলায় $\mu_1 = \mu_2 = \mu$ আর $P = {}^{2\mu}/_{R}$ অতএব গাছ থেকে পাই

$$\frac{\mu}{u} + \frac{\mu}{v} = \frac{2\mu}{R}$$

সমতলের বক্রতা ব্যাসার্ধ R = ∞ (অসীম) অতএব

$$\frac{\mu}{u} + \frac{\mu}{v} = \frac{2\mu}{R} = 0 \ , \ \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = 0 \ , \ \frac{1}{v} = -\frac{1}{u}$$

$$\text{অথবা } v = -u$$

বস্তু যদি সদ্ হয় তাহলে u ধনাত্মক হয় এবং v ঋণাত্মক হয়, অর্থাৎ বস্তু সদ্ হলে প্রতিবিম্ব অসদ্। আর যেহেতু |v| = |u|, |প্রতিবিম্ব দূরত্ব| = |বস্তু দূরত্ব|

সুতরাং এই গাছ থেকে অনেকগুলি ফল পাওয়া যায়

(ক) |প্রতিবিম্ব দূরত্ব| = |বস্তু দূরত্ব|

(খ) বস্তু সদ্ হলে প্রতিবিম্ব অসদ্

(গ) বস্তু অসদ্ হলে প্রতিবিম্ব সদ্

AB এবং CD আলোক রশ্মি দুটি P বিন্দুতে মিলিত হতে চলেছিল; কিন্তু মিলিত হয়নি। তাই এক্ষেত্রে বস্তু (object) P অসদ্ আর প্রতিফলনের ফলে রশ্মি দুটি Q বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তাই প্রতিবিম্ব Q সদ্।

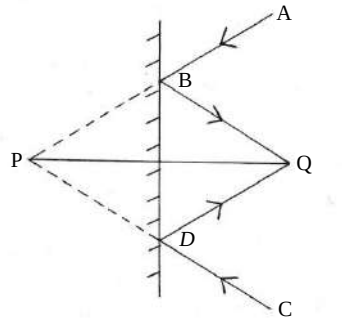

চিত্র 1. সমতলে প্রতিফলন

বিল্বফল (2) সমতলে প্রতিসরণের ফল

সমতলে প্রতিসরণের বেলায় ক্ষমতা $P = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R}$ সুতরাং $\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = P$ এই গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়

$\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R}$

সমতলে R= ∞ অতএব $\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\infty} = 0$

$$\text{অতএব } \frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = 0 \ , \ v = -\frac{\mu_2}{\mu_1} u$$

এখানেও u ধনাত্মক হলে v ঋণাত্মক, আর u ঋণাত্মক হলে v ধনাত্মক। অর্থাৎ সদ্ বস্তুর অসদ্ প্রতিবিম্ব, অসদ্ বস্তুর সদ্ প্রতিবিম্ব। কোন বস্তু তরলে d_1 গভীরতায় অবস্থান করলে তার আপাত গভীরতা d_2 হলে $v = -\frac{\mu_2}{\mu_1}u$, $\frac{v}{u} = -\frac{\mu_2}{\mu_1}$, $\frac{d_2}{d_1} = -\frac{\mu_2}{\mu_1}$, $\frac{d_1}{d_2} = -\frac{\mu_1}{\mu_2} = -2_{\mu_1}$

এখানে প্রথম মাধ্যম তরল এবং দ্বিতীয় মাধ্যম বায়ু ধরলে ${}^2\mu_1$ বায়ু সাপেক্ষে তরলের প্রতিসরাঙ্ক। ইহাকে μ_1 লিখলে $\frac{d_1}{d_2} = -\mu_1 =$ তরলের প্রতিসরাঙ্ক। $d_2 = -\frac{d_1}{\mu_1}$ এক্ষেত্রে d_1 ধনাত্মক এবং d_2 ঋণাত্মক, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব অসদ্। প্রতিবিম্বের দূরত্ব এবং চরিত্র দুইই $\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = P$ এই গাছের ফল।

বিল্বফল (3) গোলীয় তলে প্রতিফলন

যেহেতু প্রতিফলনের বেলায় $\mu_1 = \mu_2 = \mu$ এবং $= {}^{2\mu}/_{R}$, $\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = P$ এই গাছ থেকে ফল পাওয়া যায় $\frac{\mu}{u} + \frac{\mu}{v} = \frac{2\mu}{R}$

অতএব $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{R}$

যে কোন গোলীয় প্রতিফলকের ফোকাস দূরত্ব f=R/2 অতএব অন্তিম ফল $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

যেহেতু অবতল দর্পণের বেলায় সমান্তরাল আলোকরশ্মি একটা বিন্দুতে মিলিত হয় তাই ফোকাস বিন্দু সদ্ এবং ফোকাস দূরত্ব f ধনাত্মক। আবার উত্তল দর্পণ অপসারী; ফোকাস বিন্দু অসদ্ এবং f ঋণাত্মক। বস্তু সদ্ (u +ve) এবং অবতল দর্পণ (f +ve) হলে v +ve বা –ve হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবিম্ব সদ্ এবং অসদ্ দুটোই হতে পারে।

উদাহরণ, ধরা যাক u= +30 সেমি , f= +20 সেমি

$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{60}$, v=+60 সেমি, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব সদ্।

আবার u= +15 সেমি , f= +20 সেমি

$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{20} - \frac{1}{15} = -\frac{1}{60}$, v=-60 সেমি, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব অসদ্।

উত্তল দর্পণের সামনে সদ্ বস্তু রাখলেও প্রতিবিম্ব সবসময় অসদ্ চরিত্রের হয়।

উদাহরণ, ধরা যাক কোনো উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্বের মান x, অতএব f= -x (x ধনাত্মক)

$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} = -\frac{1}{x}$, $\frac{1}{v} = -\frac{1}{x} - \frac{1}{u}$, (সদ্ বস্তুর u সর্বদা +ve)

তাই, $\frac{1}{v} = -\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{u}\right) = -\frac{1}{y}$, $(\frac{1}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{u} = +ve)$, v=-y , প্রতিবিম্ব দূরত্ব সর্বদাই ঋণাত্মক। তাই প্রতিবিম্বকে কখনোই সদ্ পথে আনা যাবে না।

বিল্বফল (4) গোলীয় তলে প্রতিসরণ

প্রতিসরণের বেলায় ক্ষমতা $P = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R}$, আর মূল বৃক্ষ $\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = P$, এ থেকে পাওয়া যাবে $\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R}$

u এবং v এর চিহ্ন সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে. প্রতিসারক তল উত্তল হলে R ধনাত্মক আর অবতল হলে R ঋণাত্মক। উদাহরণ, ধরা যাক বায়ু থেকে কাঁচে প্রতিসরণ হচ্ছে, উত্তল তল দিয়ে (চিত্র 2.) সদ্ বস্তুর দূরত্ব u= +30 সেমি, বক্রতা ব্যাসার্ধ R= 10 সেমি, v= ? এখানে প্রথম মাধ্যম বায়ু অতএব μ_1=1, দ্বিতীয় মাধ্যম কাচ μ_2 =1.5,

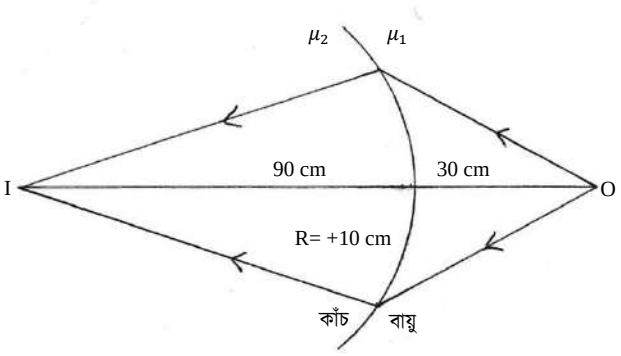

চিত্র 2. বায়ু থেকে কাঁচে প্রতিসরণ,প্রতিবিম্ব সদ্

u= +30 সেমি, R= +10 সেমি , অর্থাৎ $\frac{1}{+30} + \frac{1.5}{v} = \frac{1.5-1}{+10}$,

$\frac{1.5}{v} = \frac{.5}{10} - \frac{1}{30} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{60}$, v= +90 সেমি, অতএব প্রতিবিম্ব সদ্।

যদি u= PO= +10 সেমি, আর R= +10 সেমি হয়,

$\frac{1}{+10} + \frac{1.5}{v} = \frac{1.5-1}{+10} = \frac{0.5}{+10}$,

$\frac{1.5}{v} = \frac{.5}{10} - \frac{1}{10} = \frac{1}{20} - \frac{1}{10} = -\frac{1}{20}$,

u= -20 সেমি।

চিত্র 3. এ প্রতিবিম্ব I কে দেখানো হয়েছে মেরু P থেকে 20 সেমি দূরে। যেহেতু v= -20 সেমি প্রতিবিম্ব অসদ্।

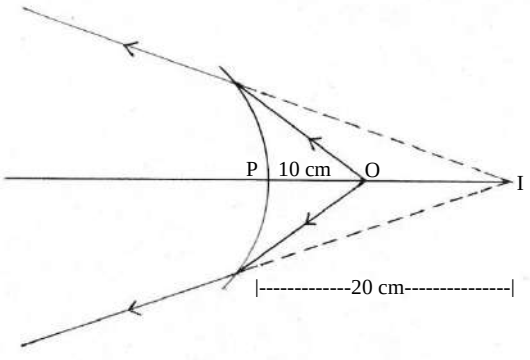

চিত্র 3. বায়ু থেকে কাঁচে প্রতিসরণ, প্রতিবিম্ব অসদ্

বিল্বফল (5) লেন্সে প্রতিসরণ

লেন্সের বেলায় প্রথম তলে প্রতিসরণের সময় প্রথম মাধ্যম পারিপার্শ্বিক যার প্রতিসরাঙ্ক μ_1 এবং দ্বিতীয় মাধ্যম লেন্সের উপাদান যার প্রতিসরাঙ্ক μ_2 . কিন্তু দ্বিতীয় তলে প্রতিসরণের সময় লেন্সের উপাদান প্রথম মাধ্যম এবং পারিপার্শ্বিক দ্বিতীয় মাধ্যম। সুতরাং প্রথম তলের ক্ষমতা $P_1 = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R_1} = \frac{\mu_1}{u_1} + \frac{\mu_2}{v_1}$ আর দ্বিতীয় তলে প্রতিসরণের সময় ক্ষমতা $P_2 = \frac{\mu_1 - \mu_2}{R_2} = \frac{\mu_2}{u_2} + \frac{\mu_1}{v_2}$

একটা উভোত্তল লেন্স ধরা যাক, এখানে প্রথম তল দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবিম্ব I_1 ইহাকেই দ্বিতীয় তলে প্রতিসরণের জন্য বস্তু O_2 হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রথম তলে প্রতিসরণের ফলে $AO_1 = u_1$ বস্তু দূরত্ব, এবং $AI_1 = v_1$ প্রতিবিম্ব দূরত্ব। দ্বিতীয় তলের অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ যদি প্রথম তলে বাঁদিকের সম্পূর্ণ অংশ লেন্সের উপাদানের মাধ্যম দিয়ে পূর্ণ থাকত আলোকরশ্মি প্রথম তলে প্রতিসৃত হয়ে অবশ্যই I_1 বিন্দুতে মিলিত হত। যদি PI_1 এর সাংখ্যমান x হয় তাহলে v_1= +x . সুতরাং প্রথম তলের জন্য ক্ষমতা $P_1 = \frac{\mu_1}{u_1} + \frac{\mu_2}{x}$. দ্বিতীয় তলে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে I_1 বিন্দুকেই বস্তুর অবস্থান O_2 ধরা হয়, এক্ষেত্রে বস্তুর দূরত্ব

$AO_2 = AI_1 = x$. কিন্তু দ্বিতীয় তলের সাপেক্ষে O_2 বিন্দুর অবস্থান অসদ্। অতএব বস্তু দূরত্ব $u_2 = AO_2 = -x$. অতএব ক্ষমতা $P_2 = \frac{\mu_2}{u_2} + \frac{\mu_1}{v_2} = \frac{\mu_2}{-x} + \frac{\mu_1}{v_2}$ যেহেতু $P_1 = \frac{\mu_2 - \mu_1}{+R_1} = \frac{\mu_1}{u_1} + \frac{\mu_2}{x}$ এবং $P_2 = \frac{\mu_1 - \mu_2}{-R_2} = -\frac{\mu_2}{x} + \frac{\mu_1}{v_2}$

মোট ক্ষমতা $P = P_1 + P_2 = \frac{\mu_2 - \mu_1}{+R_1} + \frac{\mu_1 - \mu_2}{-R_2} = \frac{\mu_1}{u_1} + \frac{\mu_2}{x} - \frac{\mu_2}{x} + \frac{\mu_1}{v_2}$

অথবা $(\mu_2 - \mu_1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{\mu_1}{u_1} + \frac{\mu_1}{v_2}$ এখানে $u_1 = AO_1$ = লেন্স থেকে বস্তুর দূরত্ব = u, এবং $v_2 = AI_2$ = লেন্স থেকে অন্তিম প্রতিবিম্বের দূরত্ব = v .

অতএব $\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_1}{v} = (\mu_2 - \mu_1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$. যেহেতু উপরের সূত্রে μ_1 পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক এবং μ_2 লেন্সের মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক সুতরাং R_1 এবং R_2 এর প্রকৃতি নির্ণয়ে পারিপার্শ্বিক (মাধ্যম 1) থেকে লেন্সের উপাদান (মাধ্যম 2) এ প্রতিসরণ বিবেচনা করতে হবে। অতএব লেন্সের ক্ষমতা নির্ণয়ের বেলায় $P = (\mu_2 - \mu_1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$ এই সূত্রে উভোত্তল লেন্সে R_1 এবং R_2 দুইই +ve, উভাবতল লেন্সে R_1 এবং R_2 দুইই –ve. উত্তলাবতল বা অবতলোত্তল লেন্সে

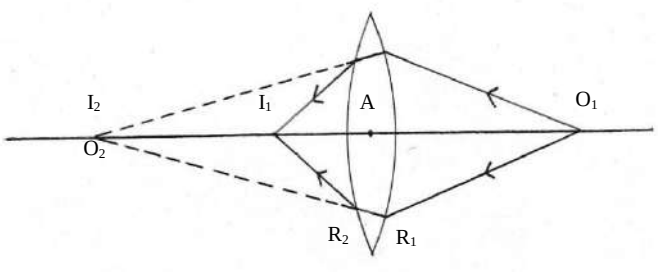

চিত্র 4. লেন্সে প্রতিসরণ

বক্রতা ব্যাসার্ধ উত্তলের জন্য ধনাত্মক এবং অবতলের জন্য ঋণাত্মক ধরতে হবে। কাঁচের তৈরি সমোত্তল লেন্সে প্রতিটি তলের বক্রতা ব্যাসার্ধ 10 সেমি বলে লেন্সের ক্ষমতা $P = (\mu_2 - \mu_1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$ এখানে μ_2 = 1.5 , μ_1 = 1.0, R_1= R_2 = +10 সেমি = 0.1 মিটার। ক্ষমতা $P = (1.5 - 1.0)\left(\frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.1}\right) = 0.5 \times (10 + 10) = +10$ Dioptre. একই বক্রতা ব্যাসার্ধের সমাবতল কাঁচের লেন্সে R_1= R_2 = -10 সেমি = -0.1 মিটার।

$P = (1.5 - 1.0)\left(\frac{1}{-0.1} + \frac{1}{-0.1}\right) = -10$ Dioptre. μ_1 পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক, μ_2 লেন্সের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক। পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে যে তল উত্তল তার R ধনাত্মক- যে তল অবতল তার R ঋণাত্মক।

পাতলা লেন্স সূত্র :-

$P = \frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_1}{v} = (\mu_2 - \mu_1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$. অথবা $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \left(\frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_1}\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$. যখন u = ∞ (সমান্তরাল রশ্মি)

v= f (ফোকাস দৈর্ঘ্য), অতএব $\frac{1}{\infty} + \frac{1}{f} = \left(\frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_1}\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$. অথবা $\frac{1}{f} = \left(\frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_1}\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$. বাজার কাটতি বইতে $\frac{1}{f} = P$ যখন পোকায় কাটা বইতে $\frac{\mu_1}{f} = P$.

বেলতলার সারাংশ

মূল বিল্ববৃক্ষ $\frac{\mu_1}{u} + \frac{\mu_2}{v} = P$

বস্তু বা প্রতিবিম্ব সদ্ পথে থাকলে তাদের দূরত্ব ধনাত্মক অসদাচরণ করলে দূরত্ব ঋণাত্মক। প্রতিফলনের বেলায় $\mu_1 = \mu_2 = \mu$, $P = {}^{2\mu}/_{R}$ অবতল প্রতিফলকে R ধনাত্মক, উত্তল প্রতিফলকে R ঋণাত্মক,

সমতল প্রতিফলকে $R = \infty$

প্রতিসরণের বেলায় $P = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R}$ প্রতিসারক তল উত্তল হলে R ধনাত্মক, অবতল হলে R ঋণাত্মক, সমতল হলে $R = \infty$ লেন্সে প্রতিফলনের সময় $P = (\mu_2 - \mu_1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$.*

*প্রশংসার পরিবর্তে অতি কঠোর সমালোচনা প্রার্থনীয়

Gravity in Quantum Mechanics and Gravity-induced quantum interference

- Dr. Amiya Bhushan Biswas Retired Professor

In addition to the strong, weak and electromagnetic forces that play the significant role for the interactions between the elementary particles, there is, as we know, a fourth force of nature - the gravity. However gravitational interaction between elementary particles (on the microscopic scale) is, in practice, so small compared with the other three that it is usually ignored.

To appreciate the difficulty involved for observing "gravity" on the microscopic scale (for micro-particles) here we considered a system of an electron and a neutron bounded by gravitational force may be called a "neutron- atom". This is the gravitational analogue of hydrogen- atom (H- atom) in which an electron and a proton are bounded by Coulomb force. For a given distance, the gravitational force between an electron and a neutron is weaker than the Coulomb force between an electron and a proton (proton mass ≈ neutron mass, M_n) by a factor ~10^{39}. The Bohr-radius of the neutron atom would be

$$(a_0)_{e-n} = \frac{\hbar^2}{(G_N m_e M_n) m_e} = \frac{\hbar^2}{G_N m_e^2 M_n} \sim 10^{31}\text{cm(!!)} \qquad (1a)$$

Where notations are as usual (G_N is the Newton's gravitational constant). On the other hand, the Bohr- radius of H- atom is

$$(a_0)_H = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} = 5.3 \times 10^{-9}\ \text{cm} \qquad (1b)$$

We note that $(a_0)_{e-n}$ is of the order of 10^{13} light year, which turns out to be much greater then the estimated radius of our universe!!

However, gravity does not remain deaf and dumb in all the arena of physical phenomena exhibited by micro (elementary)- particles. In fact, there is a remarkable phenomenon, known as the gravity- induced quantum interference which has already been confirmed experimentally. Such an extra-ordinary experiment was first conducted by R. Colella, A. Overhauser and S. A. Werner in 1975 with brilliant success [Ref[2]: Phy. Rev. Let. Vol-34, No. 23, 1472 (1975)]. Henceforth we refer it as "1975- experiment". Before discussing the marvellous phenomenon stated above and its experimental observation, we first comment on the usual role of gravity in both (non-relativistic) classical- and quantum-mechanics.

Let us consider the classical equation of motion for a purely vertical (-ẑ- direction) "free fall" of a body of mass m under gravity[1],

$$m\ddot{\vec{z}} = -m\vec{\nabla}\Phi_{grav} = -mg\hat{z}$$

Or, $\ddot{\vec{z}} = -g\hat{z}$ (2)

Where mass- factor is dropped out without any objection.

This is also true if we use Hamilton's principle of least action:

$$0 = \delta[\int_{t_1}^{t_2} L(z,\dot{z})\, dt\ ; \qquad L(Lagrangian) = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 - mgz$$

$$= [\int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{1}{2}m\dot{z}^2 - mgz\right) dt \tag{3a}$$

where , as in Eq (2) mass- factor can again be eliminated to give

$$\delta[\int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\dot{z}^2}{2} - gz\right) dt = 0 \tag{3b}$$

The situation is however different in quantum mechanics. The quantum- mechanical analogue of the equation (2) is

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial z^2} + m\Phi_{grav}\right]\psi \tag{4}$$

Or, $$i\frac{\hbar}{m}\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m^2}\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \Phi_{grav}\right]\psi \tag{5}$$

where mass-term can no longer be eliminated. Rather, it appears in combination of $\hbar/m$.

Thus, to see any non-trivial quantum mechanical effect of gravity, one must study the effects in which not only the Planck constant ħ appears explicitly but also there appears the mass m. Until 1975, there had been no direct experimental evidence for the presence of gravitational term $m\Phi_{grav}$ in the wave equation. The famous experiment "weight of photon" of V. Pound and collaborators did not test gravity in the quantum domain. The effect of $m\Phi_{grav}$- term is first observed in "1975 experiment" of R. Colella and his collaborators using thermal neutron- interferometry. We now discuss this remarkable experiment.

In 1975- experiment, a nearly mono-energetic beam of thermal neutrons was split, as shown in Fig.1, into two paths $A \to B \to C$ and $A \to D \to C$ and then brought together at the point C to produce interference. In actual experiment, neutron-beam was split and bent by silicon crystal (*details of the complicated design of neutron interferometry do not concern us). Loop dimension was taken of the order of 10 cm^2 (macroscopic size) whereas de-Broglie wavelength of thermal neutrons (mono-energetic nearly) was taken of the order of inter- atomic spacing of silicon crystal(~1.4Å) to allow diffraction scattering. Finally particles are detected by ^{3}He-detector. We now discuss the phenomenon "gravity induced quantum interference".

Since a particle (neutron) in the beam can be visualised as a wavepacket whose dimension (~1.4 Å) is much smaller than the dimension of either of the two alternate paths, forming the loop ABCD, We can apply the concept of classical trajectory. Let us first assume that the paths $A \to B \to C$ and $A \to D \to C$ lie in the same horizontal plane ABCD. Since the absolute zero of gravitational potential has no physical significance we can set $\Phi_{grav} = 0$ on the horizontal plane ABCD. Hence the two wavepackets when come to the point C along the two alternate paths (one along the path $A \to B \to C$ and the other along the path $A \to D \to C$ possess no relative phase difference which could be induced due to difference of their potential energies.

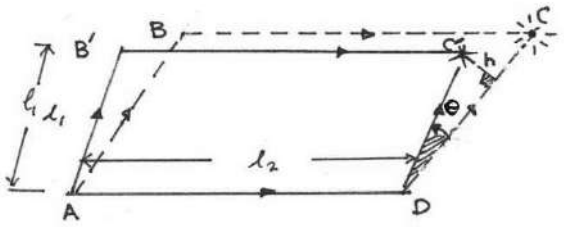

Fig.1 Schematic arrangement of 1975 experiment to detect gravity induced Quantum interference here C is the point in the interference region. The plane ABCD is assumed horizontal. $AB'C'D$ is the same plane but rotated through an angle θ ($-90^0 < \theta < 90^0$) relative to the path AD. Here $AB = DC = AB' = DC' = l_1$, $AD = BC = B'C' = l_2$

The situation, however, becomes different if the plane ABCD formed by two alternate paths $A \to B \to C$ and $A \to D \to C$ is rotated around the path segment AD by an angle say, $\theta > 0$ [Fig.1]. We label the new paths as

$$(A \to B \to C) \quad \to \quad (A \to B' \to C')$$
$$(A \to D \to C) \quad \to \quad (A \to D \to C')$$

where the lengths of the path-segments do not change but the new path B'C' is at higher level relative to the horizontal path AD (or, the plane ABCD) with vertical separation [Fig.1],

$$h = DC' \sin\theta \tag{6}$$

As shown in Fig.1, we take the lengths of the path-segments as

$$AD = DC = AB' = DC' = l_1$$
$$AD = BC = B'C' = l_2 \tag{7}$$

We now write the gravitational potential energy of the neutrons at the label $B'C'$

$$\Delta V_{grav} = M_n g h = M_n g DC' \sin\theta = M_n g l_1 \sin\theta \tag{8}$$

where M_n is the the neutron mass, as before. Since this potential energy is higher than that of neutrons along the path AD, it will lead to a gravity induced phase difference between the amplitudes of the two wavepackets arriving at the interference point C' when one of

them travels along the path $A \to B' \to C'$ and the other one covers the path $A \to D \to C'$. Infact, gravity also induces phase change for the pahts $A \to B'$ and $D \to C'$ but by equal amounts at each level height. Since we are comparing two alternate paths, the above stated effect cancel each other. The result is that the wavpacket arriving at the interference point C' along the path $A \to B' \to C'$ possesses an additional θ-dependent phase factor,

$$e^{-\frac{i}{\hbar}[\Delta V_{grav}\Delta t]} = \exp[-\frac{i}{\hbar}(M_n g l_1 \sin\theta)\Delta t] \quad (9)$$

where Δt is the time spent for the wavepackets to go from B' to C' (or, A to D). This gives the net phase-difference for the two interfering wavepackets at the point C',

$$(\Delta\Phi)_\theta = [\Phi_{AB'C} - \Phi_{ADC'}] = -\frac{i}{\hbar}(M_n g l_1 \sin\theta)\Delta t \quad (10)$$

One can now control this phase-difference by continuously changing the angle(θ) of rotation of the loop-plane ABCD from $\theta = 0$ to $\theta = {}^{\pi}/_{2}$ or $\theta = -{}^{\pi}/_{2}$.

Before calculating the numerical values of $(\Delta\Phi)_\theta$ for various values of θ, we express the time interval Δt in terms of de-Broglie wavelength $\lambda\!\!\!^{-} = \lambda/2\pi$. Since $\Delta t = {}^{l_2}/_{v_w}$ where v_w is the velocity of the web packet corresponding to its momentum p_w, we have

$$\Delta t = \frac{l_2 M_n \lambda\!\!\!^{-}}{\hbar} \quad (11)$$

Which is typically of the order of 10^{-4}s for l~5cm and $\lambda\!\!\!^{-}$~1.4Å (Δt is much less than the the mean life-time of neutrons. Use of Eq.(11) in Eq.(10) allows us to write

$$(\Delta\Phi)_\theta = -\left[\frac{M_n^2 g l_1 l_2 \lambda\!\!\!^{-}}{\hbar^2}\right]\sin\theta \quad (12)$$

We can now predict and observable interference effect that depends on angle θ. It is interesting that the magnitude of $(\Delta\Phi)_\theta$ is of right order for detection with thermal neutrons travelling through the path-length ~few centimetre. Inserting the numerical values of M_n, g and ħ and taking (nearly the values as used in 1975-experiment), $l_1 l_2 = 10$ cm^2 and $\lambda = 1.42$Å (comparable to the inter-atomic spacing in silicon crystal) we obtain

$$\frac{M_n^2 g l_1 l_2 \lambda\!\!\!^{-}}{\hbar^2} \cong 55.88 \quad (13)$$

and

$$(\Delta\Phi)_\theta \cong 55.88 \sin\theta \quad (14)$$

Now as the plane of the loop ABCD is gradually rotated by 90^0 the intensity in the interference region is expected to show a series of maxima and minima. Quantitatively we should find 9 oscillations,

$$\frac{55.88}{2\pi} \cong 9 \qquad (15)$$

The results obtained in 1975-experiment of R. Colella *et.al* are found in agreement with all these predictions. The numerical results of this experiment are shown in Fig.2 for θ-values lying in the range $|\theta| \leq 30^0$. (This experiment was performed at the University of Michigan using Ford nuclear reactor. For details see Ref.[2])

The result demonstrates that is gravitational potential coherently changes the phase of a neutron wave function. What we must emphasize is that the gravity interference is purely quantum mechanical because as ħ→0, the interference pattern gets washed out. This experiment also shows that the gravity is not purely geometric at the quantum level because the effect depends on the factor $\left(m/\hbar\right)^2$. It also makes sure that there is no distinction between gravitational and inertial mass (otherwise we would have to replace the quantity $\frac{m}{\hbar^2}$ by $\frac{m_g m_i}{\hbar^2}$).

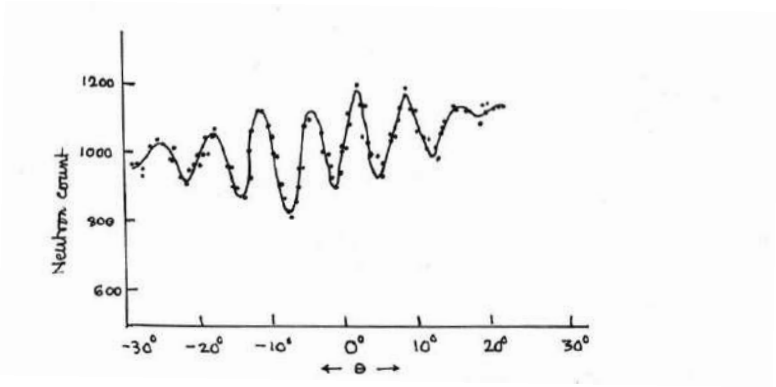

Fig. 2 Dependence of gravity induced phase on the angle of rotation θ of the neutron beam loop.

Ref:

[1] Modern Quantum Mechanics by J. J. Sakurai (Sect. 2.6)

[2] Phys. Rev. Lett. Vol- 34, nNo. 23, 1472 (1975)

Paper: Observation of gravitationally induced quantum interference by R. Colella, A. Overhauser and S. A. Werner.

[†] The equation of motion in gravitational field is $m_i\ddot{\vec{r}} = -m_g\vec{\nabla}\Phi_{grav} \rightarrow \ddot{\vec{r}} = \frac{m_g}{m_i}\vec{\nabla}\Phi_{grav}$ where Φ_{grav} is the gravitational potential, m_i is the "inertial mass" of the body and m_g is its "gravitational mass". E*ö*tv*ö*s *et al* (1896, 1908,1922) experimentally concluded that $m_g = m_i$. This equality of inertial mass and gravitational mass is referred to as the E*ö*tv*ö*s law. E*ö*tv*ö*s *et al* (1922) concluded that this equality is true to one part in 10^9. Latter Dicke and his collaborators (1964) and Braginskii and Panov (1972) repeated E*ö*tv*ö*s experiment with greatly refined apparatus and could reduce the uncertainty to less than one part in 10^{11} and 10^{12} respectively.

- Sraboni Das, Ex Student.

Physics, spherical balls and the games people play

- Dr. Bhupati Chakrabarti, Retired Professor

The very word 'ball' provides with an impression of a perfect sphere. In physics while dealing with a number of situations and problems involving motion, rolling or gravitational attraction between two bodies or the collision between two bodies or even the interaction between two molecules we come up with the analogy of balls. A ball refers to a solid, hard and incompressible perfect sphere. That helps us in our calculations and depending on the situation this is a well accepted approximation. Remember, we consider the earth to be a perfect sphere in number of calculations as that makes our life easier, though we know that earth is actually an oblate spheroid and its equatorial diameter is about 43 km longer than its polar diameter. In dealing with the kinetic theory of gases we like to assume that the gas molecules are not only spherical but among themselves suffer elastic collision only. We either talk about point charge, point mass or like to assume lot of things as spherical ones if we are talking about an extended body.

Balls are integral part of large number of games. Interestingly the most of the ball games use the balls, strictly speaking, that are not perfect spheres. Yet they are often referred to as balls. Whenever we start talking of the shape of an odd 'ball' the name of rugby ball comes to our mind first. Yes it is also a ball: rugby ball. It is evidently an ellipsoidal one, yet it is called rugby football. Some people confuse it with the balls used in American football and that only shows what type of ball is used in that game. The game of soccer or what is known as football without any adjective is possibly the most popular ball game and is played all over the world. It is played with a ball that is also not a perfect sphere. The soccer balls are made of leather and have got the actual shape of a Buckminster Ball or a Bucky ball. It has the structure of a famous C60 molecule, a molecule of an allotrope of carbon comprising of 60 carbon atoms. It consists of 20 regular hexagonal (six sided) and 12 regular pentagonal (five sided) surfaces. It is also referred to as truncated icosahedron and is an example of an Archimedean solid. It has 60 vertices and 90 edges. It is more spherical compared to the other solids of this group, because the panels bulge due to the pressure of the air inside. But this ball, strictly speaking is not a perfect sphere.

Golf balls are spherical but have dimples on the surface for the reduction of viscous drag of the air. These dimples help a golf ball to fly a longer distance when struck upon by a golf stick and can spin about its own axis. That helps the ball to swing while on their trajectory, an example of Magnus effect in action. Footballers try to generate the curved kicks by making the kicked ball swing in the air by imparting spin in the ball while kicking. The spinning ball during its flight gets deviation in its trajectory as a force comes into play on one side because of Magnus effect. Similar thing happens in lawn tennis or simply tennis when a player serves the ball by introducing spin on the ball. Once again we can notice the tennis ball is also not a perfect sphere as it has a curved dented line on its surface. A closer look at the balls used to play volleyball, or basketball will reveal that they are really not spherical as they have dented stripes on them. The style or the ways the dents are made has got strong connection with the type of the game. Because we know

that in the games of volleyball or basketball the ball is released in the air with or without spin and this release has got a lot of things to do with the various aspects of the game. So the right kind of release of the ball demands the skill from the concerned player. Table tennis ball is also not a perfect sphere and the jointing mark between two halves has a crucial role in the generation of the spin in the game along with the nature of the rubber surface in the TT player's bat. Hockey (field hockey) balls are spherical and are mostly white in colour but they may be smooth or may have indentations on the surface. So even in an international hockey match one can use a ball that is not a perfect sphere.

Let us finally take up the issue of cricket balls. We now have come to know that cricket is not only played with red balls but also with white balls, and pink balls. And why are they special? Why do people talk a lot about them particularly when analyzing the performance of a player taking into consideration of the colour of the ball he is playing with. There are reasons. First here also all balls are really not innocent spheres. And cricket balls are definitely not perfect spheres with their seams that are very important characteristic of the game. Even the colours of the balls are important as that indicates the type of materials that the strings are made of and have been used to stitch the two halves of the balls that are otherwise similar irrespective of their colours. Then there is the type of polish used to cover the surface of the ball. There are more aspects but I am really not going further.

With the stitches on the surface the cricket balls are obviously not perfect spheres. The stitches have got very important roles in the production of swings and spins and in some cases reverse swings. Of course there are other factors like the wind flow or the bounce of the pitch that one needs to complete the story. The red ball is stitched with a white thread while the pink ball is stitched with a black thread. A red ball is wax polished. As the match progresses, the ball absorbs the wax and the players are able to reverse swing the ball by rubbing and maintaining one side.

Finally we need to remember that ice hockey is played with a puck. A puck is a disc made of vulcanised rubber that does not roll during the play but slides over the ice surface. This is also called flat ball for obvious reason. And badminton involves a shuttle cock. Then there are relative sizes and permissible masses of these so called balls about which we have not discussed. All these will lead to a 'different ball game' that we should not start in the limited space of this excellent publication brought out by the Department of Physics, City College, where I spent many great years as a teacher.

রামমোহন রায় হোস্টেল

- অচ্যুত কুমার চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ১৮ টি হল বা হোস্টেলের মধ্যে এই 'রামমোহন রায় হল' অন্যতম বড়ো ও এক ঐতিহ্যপূর্ণ হোস্টেল। ১৯১৮ সালে তৈরী হয়েছে এই হোস্টেল, তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নির্মিত অট্টালিকা সদৃশ এক ত্রিতল বাড়ি, আমহার্স্ট স্ট্রীট সিটি কলেজ, রামমোহন কলেজ ও আনন্দমোহন কলেজ লাগোয়া ছাত্রদের থাকবার জন্য এক আদর্শ বাড়ি। কমবেশি ১৫০ জন ছাত্র থাকবার ব্যবস্থা। শুধুমাত্র অনার্সের ছাত্রদের জন্য। সিটি কলেজের ১২০ ও আনন্দমোহনের সর্বোচ্চ ৩০ জন ছাত্র থাকতে পারে। জমিটি ব্রাহ্মসমাজের, বাড়িটি সরকারের তৈরী, হলের মূল দায়িত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র সিটি-আনন্দমোহনের অনার্সের ছাত্ররাই থাকবে। কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের ও সহ-সুপারের নিয়োগ এবং মেস-স্টাফ ও দারোয়ান প্রভৃতি স্টাফদের নিয়োগপত্র ও মাইনে ইত্যাদির দায়িত্ব- সবই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। হলের উল্টোদিকেই আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা।

রামমোহন রায় হল, জানুয়ারী 1993

১৯৯২ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সিটি-আনন্দমোহন কলেজের রেক্টর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের মুখমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আমলের চীফ সেক্রেটারি তৎকালীন আই.সি.এস ডঃ করুনাকেতন সেন মহাশয় আমায় ডেকে হোস্টেলের দায়িত্ব নিতে বললেন। তিনি আমার মাতামহ জেলা-জজ শ্রী অক্ষয় চক্রবর্তী ও আমার বড়দা বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রী অজিত চক্রবর্তীকে চিনতেন। বললেন- 'হোস্টেল পরিচালনার ব্যাপারে সব রকম স্বাধীনতা থাকবে তোমার। দায়িত্বটি নাও।' -এ যেন তার স্নেহভরা আদেশ।

২০ শে জুলাই, ১৯৯২ ইং, সোমবার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'হল সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট' হিসেবে আমার এপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে গেছে। কলেজ অধ্যক্ষের হাত থেকে তা পেলাম। সহ-অধ্যক্ষ শ্রীব্যানার্জী সহ হোস্টেলে প্রবেশ করি। তিনি পুরো বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন। এরপর সুপারের কোয়ার্টারে পৌঁছে আমার হাতে হলের চাবিসহ একটা খাম দিলেন। তিনি হল ছেড়ে বেরোতেই, এতক্ষন আমাদের পেছনে

থেকে যেসব আবাসিক ঘুরছিলো তাদের ডেকে নিলাম। বেশ ক'জন একসাথে বলে উঠলো –'স্যার, আপনিও চলে যাবেন না তো? আমরা কিন্তু বেশ কষ্টে কাটিয়েছি বিগত দেড় বছর।'

প্রশ্নটা শুনে আমি ছাত্রদের একটাই কথা বললাম –'দায়িত্ব যখন নিয়েছি, আমি কাজ করার জন্যই এসেছি। ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সব অভাব অভিযোগ মেটাতে পারি। আমার কথা শুনে চললে আমি থাকবো। অনেক পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি। আগামী ২৬ শে জুলাই রবিবার বেলা ১২ টায় হলঘরে তোমাদের সাথে কথা হবে। লিখিত ভাবে সব অভাব-অভিযোগের বিষয় জানাবে। যারা বাইরে মেসে থাকছে, তাদেরও খবর দিও।' ছাত্ররা জানাল- 'তারা সব নির্দেশ মেনে চলবে, অন্যথা হবেনা।'

ছেলেরা কেউ কেউ মেসের ও হোস্টেলের রি-এডমিশনের টাকা জমা দিল। প্রতিদিন দু'ঘন্টা অফিসে বসবো বলে ছেলেদের জানালাম। এরপর দারোয়ান বাহাদুরকে ও মেস স্টাফ অনন্তকে ডেকে নিলাম। ওদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আগামীকাল অর্থাৎ ২১শে জুলাই থেকে মেস চালু করার জন্য অনন্তকে বললাম। দু'টি ছাত্র ও অনন্তকে সই করিয়ে মেসের খরচের কিছু টাকা আপাতত দিলাম ওদের হাতে। Sweeper ও Electrician কে খবর পাঠানো হলো। ওরা এলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হল। পরদিন বেলা ১২ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত আমি হলের অফিসে উপস্থিত হয়ে সব কাজগুলো একে একে বুঝে নিলাম। ৭৪ বছরের হোস্টেলের দুটো আলমারিতে Office Files, Registers & related papers সামান্যই ছিল। তাই নতুনভাবে কাজ শুরু করতে হলো। পূর্বতন সুপারের সাথে সাক্ষাৎ করে জানলাম যে, বহু আবাসিক মেস ও হলের fees না দেয়ায় সমস্যার অন্ত ছিল না। গত ২০ বছর ধরে একই চিত্র। হোস্টেলের করুণ অবস্থার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে জেনে নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে এগোনোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিতে হাত দিতে হলো। বহু টাকার ঘাটতি হয়ে রয়েছে বিগত ১৫/২০ বছরে। প্রাক্তন সুপারের সাথে আলোচনার পরে ঠিক করলাম- নতুন ছেলেরা এডমিশন নিলেই পাশ করে যাওয়া ছেলেদের caution deposit এর অর্থ ফেরত দিয়ে clearance দেব। এভাবেই আগেও চলেছে। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক যে পরিমান অর্থ জমা করার কথা, তাও সময় মতো দিয়ে দেব। এভাবে চলে সুন্দর ভাবে আর্থিক সংকটের থেকে মুক্ত হয়ে ঘাটতিও অনেকাংশে কমিয়ে আনা হলো। প্রতিবছর সঠিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট টিম এসে অডিট করে প্রশংসাপত্র দেয়। পরদিন থেকে তিনটে ফ্লোরে তিনটে ক্যান্টিন চালু করার ব্যবস্থা করা হলো।

২৬শে জুলাই, বেলা ১২ টায় আমি, সহ-সুপার শ্রী অনিল দত্ত সহ হল ঘরের সভায় এলাম। প্রায় ৮০ জন আবাসিক ছাত্র ফ্লোরে সতরঞ্জি পেতে বসেছে। পেছনে বসেছে হলের কর্মীবৃন্দ। আমরা প্রবেশ করতেই সবাই উঠে দাঁড়ালো। সবাইকে বসতে বলে আমরা দুজনে চেয়ারে বসলাম। সারাটা হলে একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আমি সবাইকে শান্ত থাকতে বলে ওদের মধ্যে থেকে একজনকে এসে কিছু বলতে বললাম। আবাসিকদের হয়ে সৌমিত্র সাহু এসে তাদের এতকালের অভাব অভিযোগের বিষয়ে

হাতের কাগজখানা দেখে তাতে লেখা দাবীসমূহ পড়ে শোনাল। এরপর ওই দাবীপত্রবিশিষ্ট লেখাটি আমার হাতে তুলে দিলে আমি দাঁড়িয়ে ওদের ৩৪টি দাবির সাথে আরও ১৬ টি বিষয় যুক্ত করে সর্বমোট ৫০টির কথা বললাম। বিগত ৫/৬ দিন হলে এসে হলের উন্নতিকল্পে কি কি করা উচিৎ, কি কি করতে পারবো, তার একটা পরিষ্কার ধারণা করে রেখেছিলাম। তাই ওদের জানালাম- 'খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ৩০/৩৫টা দাবীর সমাধান করা যাবে। বাকিটা এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই আশাকরি সম্ভব হবে।' আরও বললাম- 'আমি থাকতে এসেছি কিছু কাজ করবো বলেই। যতটা শ্রম দেওয়া সম্ভব, আমি দেব। শুধু তোমাদের সহযোগিতা চাই। ১৮ টি হোস্টেলের মধ্যে এটিকে সর্বোচ্চ সম্মানে তুলে আনাই হবে আমাদের উদেশ্য। আমি তখনই হোস্টেল ছেড়ে চলে যাব- যখন দেখব যে তোমাদের আচরণ আমার মনে আঘাত দিয়েছে। আমিও পড়াকালীন হলে থেকে পড়েছি।'

এই বলে শেষ করতেই ছেলেরা একসঙ্গে বলে উঠলো – 'স্যার আমরা সবাই আপনার নির্দেশ ও পরামর্শমত চলবো, এর অন্যথা হবে না।'

সভা সাঙ্গ হল। আবাসিকদের ৩৪ টা দাবী ছিল এরকম :-

(১) আমাদের থাকবার জন্য শোবার খাট বা চৌকি ভেঙে গেছে। (২) সবার চৌকিও নেই, দুজনকে একসঙ্গে শুতে হয়। (৩) অনেকের টেবিল নেই, কোনটা ভেঙেছে বা নড়বড়ে। (৪) অধিকাংশ আবাসিকেরই ঘরে চেয়ার নেই। (৫) প্রায়ই নিজেদের বাল্ব কিনে আলো জ্বালাতে হয়। (৬) পাখার কোনো ব্যবস্থাই নেই। (৭) ত্রিতল বাড়ির কোনো বারান্দায় আলো জ্বলে না। (৮) মোট ১৯ টা টয়লেটের অবস্থা শোচনীয়, নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত। (৯) ৩/৪ টিতে ছাড়া বাকিগুলোতে আলো নেই, জল নেই, কল ও পাইপ ভাঙা। (১০) লাইব্রেরীতে বই প্রায় নেই বললেই চলে। ৮/৯ বছর লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে আছে। (১১) রিডিং রুম নেই, কোন সংবাদপত্র বছর দেড়েক হলো আসে না। (১২) পাম্প মোটর খারাপ হওয়ায় ওপরে জলই ওঠে না। (১৩) অনেক ঘরের জানালা দরজার অবস্থা শোচনীয়। ঘরে বৃষ্টির জল আসে। (১৪) এক বছরের বেশি সময় ঝাড়ুদার আসেই নি। (১৫) কুকুর, ছাগল বারান্দায় শুয়ে থাকে, নোংরা করে। ঘরেও ঢুকে যায়। (১৬) খেলার কোনো ব্যবস্থাই নেই। (১৭) যখন তখন বাইরের লোক, এমনকি ভিখিরিও হোস্টেলে ও ঘরে ঢুকে পড়ে। (১৮) নিরাপত্তার ভীষণ অভাব। দারোয়ান গেটে থাকেই না। (১৯) এক বছরের উপর ডাইনিং হল বন্ধ। বাইরে খেতে হয়। (২০) হলের অব্যবস্থার জন্য বহু আবাসিক বাইরে গিয়ে মেসে থাকছে। (২১) তিনটি ফ্লোরে ছ'টি বাথরুম থাকা সত্ত্বেও নিচের চৌবাচ্চায় এসে ঘোলা গঙ্গা জলে স্নান করতে হয় সকাল সকাল, নয়তো জলই পাওয়া যায় না। (২২) দারোয়ান কাজ না করায় বাইরের লোক এসে স্নান করে যায় চৌবাচ্চায়। (২৩) প্রায় এটা সেটা চুরি হয়। (২৪) ক্যান্টিন না থাকায় পড়াশোনা ফেলে সকালে বাইরে দূরে গিয়ে টিফিন করে আসতে হয়। (২৫) এক বছরের বেশি হয়েছে, কিন্তু কোনো ছাত্রই হোস্টেলে ভর্তি হতে পারছে না। (২৬) হোস্টেলের লাগোয়া ফুটপাতে অসামাজিক কাজকর্ম চলে ছাউনি ফেলা ঘরের মহিলাদের নিয়ে। (২৭) অসুস্থ হলে কেউ দেখার নেই। (২৮) সুপার না

থাকায় কোনো হলকর্মী বিপদে বা প্রয়োজনে সাহায্য করেনা। (২৯) কলেজে গন্ডগোল হলে তার প্রভাব পড়ে হলে। (৩০) মনোরঞ্জনের জন্য টিভি বা অন্য কোন সুবিধাই নেই। (৩১) বাইরের বাজে ছেলেরা এসে হলে রাত কাটিয়ে হৈ হট্টগোল করে যায়। (৩২) পরীক্ষা থাকলেও পাশের ঘরেই হয়ত ইংরেজি বা হিন্দি গান প্রচন্ড জোরে চলে। (৩৩) হলে নেতা গোছের কিছু ছেলের অত্যাচার সইতে হয়। (৩৪) আমরা খাওয়া চাই, জল চাই, আলো চাই, হলে সুষ্ঠু পরিবেশ চাই।

আমি বললাম- এইসব দ্রুত হয়ে যাবে। তোমাদের হয়ে আরও ১৬ টি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, অর্থাৎ মোট ৫০ টি দাবী হবে তোমাদের।

(৩৫) আগামী কাল থেকেই হলের যাবতীয় কাজ শুরু হবে। (৩৬) আগামী কাল থেকেই দু'টি সংবাদপত্র পাবে- একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি। (৩৭) আগামী মাসের মধ্যেই নতুন ছাত্র ভর্তি শেষ হলে একটি রঙিন টিভি কিনে দেওয়া হবে। (৩৮) জলের পাম্পের এমন ব্যবস্থা থাকবে যেন প্রতি ফ্লোরে ছাত্ররা ২৪ ঘন্টা জল পায়। (৩৯) ভাঙা দরজা-জানালা পুরোপুরি সারাই করা হবে। (৪০) দ্রুত প্রতি রুমের টেবিল-চেয়ার-খাটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। (৪১) ঘরের, বারান্দার, টয়লেটের, হলঘরের, রান্নাঘরের ও খাবার ঘরের লাইট ও পাখার ব্যবস্থা করা হবে। (৪২) অন্ততঃ ১০০০ বই এর একটি সুন্দর লাইব্রেরী করা হবে। (৪৩) অভিভাবক বা অন্য কেউ দেখা করতে এলে বসার সুবন্দোবস্ত থাকবে। (৪৪) প্রতিবছর শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা পিকনিকের ব্যবস্থা হবে। (৪৫) স্নান করা বা অন্য সব কাজের জন্য অপরিশোধিত নোংরা ঘোলা জলের পরিবর্তে পরিশোধিত ও পরিষ্কার জল পাওয়া যাবে। (৪৬) প্রতিবছর জাঁকজমকপূর্ণ সরস্বতী পুজো এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। (৪৭) প্রত্যেক ফ্লোরে আয়না ও বেসিনের ব্যবস্থা থাকবে। (৪৮) মেন গেটের পাশের ফুটপাতে একটি সুন্দর ফুলের বাগান হবে। (৪৯) পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য ও আবাসিকদের বিশেষ গুণের জন্য বার্ষিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেয়া হবে। (৫০) হোস্টেল ও কলেজের অভ্যন্তরে একটি করে টেলিফোন বুথ বসানো হবে।

এতো সবের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ছাত্ররা সবাই অবাক হয়েছে। এরপর ২৭শে জুলাই থেকে কলেজের ক্লাস শেষ করে হোস্টেলে এসে ছাত্রদের প্রয়োজন মেটাতে হল-কর্মীদের সাহায্যে কাজগুলো একে একে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিই। ২রা আগস্ট ১৯৯২ ইং, সপরিবারে এসে সুপারের কোয়ার্টারে উঠি। সহ-সুপার চলে আসেন তার কোয়ার্টারে। আর পরদিন থেকে সকালে দু'তিন ঘন্টা করে সহ-সুপারকে নিয়ে অফিসে বসে কাজ শুরু করি।

কিছু কালের মধ্যেই হোস্টেল পুরো পরিচ্ছন্ন হয়। দারোয়ান বাহাদুর ও তার অপর সাথী সিংজী গেট দেখাশোনা করে নিয়মিত। অগাস্টের মধ্যেই সব আলো পাখা লাগানো হয়ে যায়- সর্বত্র বৈদ্যুতিক সংযোগগুলো সারাই বা নতুন করে লাগানোর পর। সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব ঘরের দরজা, জানালা ও টেবিল -চেয়ার-খাট সারাই এর কাজ সম্পন্ন হয়। তালাবন্ধ ত্রিতলের লাইব্রেরী থেকে অল্প কিছু বই সহ দুটো

আলমারী নীচে অফিসঘরে নিয়ে আসা হয়। পুজোর ছুটির পর পরই কলেজ স্ট্রীট থেকে বেশ কিছু বই আবাসিকদের লাইব্রেরী কমিটির মাধ্যমে কিনে আনা হয়। রেজিস্টার তৈরী করে ঐ কমিটিই বই দেয়া নেয়ার কাজটা করে। অফিস ঘরের ভেতর ও বাইরেটা খুবই অপরিষ্কার ছিল। পরিষ্কার করার পর অফিসের আলমারীক'টা থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তেমন কিছুই রেকর্ডস্ পাওয়া গেলো না। সহ-সুপার এর আগেও দু'জন সুপারের সাথে কাজ করেছেন। অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি। আমার কাজের ধরন দেখে বললেন- 'আপনিই পারবেন ভালোভাবে হোস্টেলের পরিবেশ সুন্দর রাখতে।' ৭৫ বছরের হল, তার বহু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, রেজিস্টার, ফাইলপত্রাদি থাকার কথা। সামান্যই মিলল। তাই সবটাই নতুন করে শুরু করতে হলো। সহ-সুপার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে কর্মরত। হলের অফিসের কিছু কাজকর্ম ছাড়াও তিনি আবাসিকদের কাছ থেকে মেসের জন্য টাকা নেয়া ও মেস-কমিটিকে টাকা দেয়ার কাজগুলো করতেন। আমাকে দেখতে হতো ছাত্র ভর্তি, পুরনো ছাত্রদের ক্লিয়ারেন্স দেয়া, অভিভাবক ও ছাত্রদের সাথে কথা বলা, হলের সব কাজকর্ম দেখা, ইত্যাদি। সুপারের কোয়ার্টারের একটা ঘর, হলের কাজকর্মের জন্য আমি ব্যবহার করতাম। নতুন রেজিস্টার তৈরি হয়েছে এইগুলোঃ- ১) বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয় রেজিস্টার- ছাত্রদের বিষয়ে, ভর্তি ইত্যাদি, ২) একাউন্টস রেজিস্টার, ৩) আবাসিকদের নাম, ঠিকানা, ক্লাস, রোল নাম্বার, ইত্যাদি, ৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয় কর্মীদের অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার, ৫) মেসের রেজিস্টার, ৬) দৈনন্দিন কাজের ও আয়-ব্যয়ের বিষয়াদি।

হোস্টেল সুপারের চেম্বার, 1994

অডিটর এসে ১ থেকে ৪ নম্বর রেজিস্টার পরীক্ষা করেন প্রতিবছরে এবং অডিটের পর, প্রশংসাপত্র দেন। দু'বছর পর অডিটর বললেন- 'কোন হলই যথাসময়ে অডিট করতে পারে না, আপনাদের হল ছাড়া।' অফিস ঘরের পাশেই রিডিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়। ওখানেই আসে প্রতিদিন বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র। ত্রিতলের লাইব্রেরী রুমটা ছাত্রদের থাকার জন্য ছেড়ে দেয়া হলো। ১৮৫ টা বেডের ব্যবস্থা হল, যাতে ১৫০ এর পরিবর্তে ১৮৫ জন ছাত্র আবাসিক হিসেবেই থাকতে পারে। পুজোর ছুটির আগেই ৬০টি ছাত্রের স্থলে রিএডমিশন করার পর ১০২টি ছাত্রের স্থায়ী রুমের ব্যবস্থা হল। সেপ্টেম্বর থেকেই নতুন ছাত্র ভর্তি হতে শুরু করে দেয় - নতুন নিয়ম অনুযায়ী অর্থাৎ স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেন্ডারিতে অধিক নম্বর পাওয়া ছাত্ররা 'হলে' আগে স্থান পাবে, দূরবর্তী অঞ্চলের খারাপ রেজাল্ট করা ছাত্ররা নয়, যা এতদিন চলছিল। এরপর এক পক্ষকালের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি ঘোষণা হলে প্রতিযোগিতার নামে সব আবাসিক উঠে পড়ে লাগল। ১৫ দিন পর আমার তিন সহঅধ্যাপক বন্ধু পুরো হল পরিদর্শনের পর দশটি রুমকে আদর্শ বলে ঘোষণা করল। এর আবাসিকদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেয়া হবে।

এরপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ হয়েছে, তা হল –

(১) রঙিন টিভি ক্রয় করা। একদিন সকালে আটটি ছাত্রকে নিয়ে দু'টো ট্যাক্সিতে চেপে চলে এলাম ডালহৌসিতে। ওখানে সোনি ওয়ার্ল্ড থেকে কালার্ড সোনি টিভি কিনে সোজা হোস্টেলে। সন্ধ্যায় টিভি চালু হয়ে গেলে - ছেলেদের সে কি আনন্দ!

(২) তারপর যেটা করা সম্ভব হল - তা হলের ৭৫ বছরের ইতিহাসে বা কলেজের শতাধিক বর্ষের মধ্যে কোনোকালেই ছাত্রদের জন্য করা হয়ে ওঠেনি। ভাবা হয়েছে কিনা সন্দেহ। যা হল, তাতে সব ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাড়ির সাথে যেকোন সময় যোগাযোগ করতে পারত। দু'টি ফোন বুথের ব্যবস্থা হল। একদিন দু'টি ছাত্রসহ আমি পৌঁছে গেলাম কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী শ্রী অজিত পাঁজার বাড়িতে। তাঁর চেম্বারের সামনে তখন অপেক্ষমান বহু লোক। আমি আমার ব্যক্তিগত কার্ড পাঠালাম তাঁর কাছে। ৭-৮ মিনিট পরই আমার ডাক পড়ল। ভেতরে যেতেই শ্রী পাঁজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– 'স্যার, আসুন, বসুন। তারপর, আপনার জন্য কি করতে পারি?' আমি বললাম– 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হোস্টেলের মধ্যে ১৮৫ বেডবিশিষ্ট 'রামমোহন রায় হল' অন্যতম বড় হল। আমাদের হলের জন্য একটি ও পাশের সিটি-রামমোহন-আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরেকটি- এই দু'টি টেলিফোন বুথ খুব জরুরী, ওদের সাথে বাবা-মায়ের কথা বলার জন্য। হলের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব হবে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ (ইং) তে। সুন্দরবন থেকে অরুণাচল বা মনিপুর, এদিকে দার্জিলিং-কোচবিহারের ছেলেরা এখানে এসে পড়াশোনা করে ও হলে থাকে। আর কাজের সুবিধার জন্য আমার কোয়ার্টারে একটা ফোন দরকার।' -এই বলে আমি থামলেই তিনি বললেন– 'হয়ে যাবে। টেলিফোন অফিসে গিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিন, এক মাসের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। আর কোন প্রয়োজন হলে অবশ্যই জানাবেন।' হলে ফিরে এলাম। পরদিন কলেজ অধ্যক্ষের চিঠি নিয়ে চলে যাই টেলিফোন অফিসে। এক মাসের আগেই সব কাজ হয়ে যায়। শ্রী পাঁজা এর আগে কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ছিলেন। আবাসিক ছাত্ররা ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা খুশিতে টগ্‌বগ্‌ করছে। এটি অন্যতম বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কয়েন ফেলে ছেলেরা যত খুশি কথা বলতে পারে দিন রাতের যেকোন সময়ে।

(৩) তার চেয়ে বড় একটা কাজ করার জন্য ছুটে গেলাম কলকাতার তৎকালীন মেয়র শ্রী প্রশান্ত চ্যাটার্জির কাছে। তাঁর সাথে দেখা করে দু'টো আর্জি জানালাম– (ক) '৭৫ বৎসরের একটি হোস্টেলে মিষ্টি জলের পরিবর্তে নোংরা ঘোলা অপরিশোধিত গঙ্গাজল ১৮৫ জন আবাসিককে ব্যবহার করতে হয় সব কাজে, মাত্র তিন ঘন্টা সময়ের মধ্যে। পরিশোধিত মিষ্টি জলের ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করি।' (খ) 'লাগোয়া ফুটপাতের ছাউনি দেয়া ঘরবাড়ি তুলে দিয়ে ওখানে একটি সুন্দর ফুলের বাগান করে দিলে সব দিক থেকে ভালো হয়।' তাঁর কাছে আশ্বাস পেয়ে হলে ফিরে আসার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে দুটি কাজই সম্পন্ন হল। এমন জলের ব্যবস্থা হয়েছে এখন, যে আগামী ১০০ বছরেও দিবা-রাত্রি জলের অভাব হবে না।

(৪) এরপর পাম্প মোটর চালু করা হল। এবারে তিনটি ফ্লোরেই ২৪ ঘন্টা পরিশোধিত জল পেতে থাকলো ছাত্ররা। প্রতিটি ফ্লোরেই দু'টি করে বেসিন ও আয়না বসানো হল এই প্রথমবারের মতো।

(৫) সরস্বতী পূজা ও বার্ষিক অনুষ্ঠান জাঁকজমকের সাথে সম্পন্ন করার জন্য দশজন আবাসিকের একটি কমিটির সাহায্যে যা করা হলো, তার মধ্যে আছে– (ক) শ্রী সৌমিত্র সাহুর সম্পাদনায় একটি সুন্দর সুভ্যেনীর প্রকাশ, (খ) চারটি দেয়ালে দেয়াল পত্রিকার আদলে আবাসিকদের রচনা ও অঙ্কন, (গ) চমৎকার সব আলপনা দেওয়ার ব্যবস্থা, (ঘ) অন্য ১৭টি হোস্টেল আবাসিকদের বিশেষ আমন্ত্রণ, (ঙ) সিটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সৌমিত্র চ্যাটার্জী ও রবি ঘোষকে আমন্ত্রণ, (চ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ভারতী রায় (মুখার্জী) কে তিন দিনের অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে 'রক্তদান শিবিরে' প্রধান অতিথির জন্য আমন্ত্রণ, (ছ) ডঃ করুণাকেতন সেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অজিত পাঁজাকে আমন্ত্রণ। (প্রাক্তন) রাজ্যের মন্ত্রী ও প্রাক্তন হোস্টেল সুপার ও সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রী প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্তকে দ্বিতীয় দিনের পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ, (জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-রেজিস্ট্রার ও হলের প্রাক্তন সহ-সুপার শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপকদের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, (ঝ) ছাত্রদের উৎসাহে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জোজোকে নিয়ে আসা, (ঞ) দ্বিতীয় দিনে পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া ও পরিচ্ছন্নতায় দশের একজন হওয়ার জন্য পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রদান।

(৬) বার্ষিক শিক্ষামূলক ভ্রমণে তিনদিনের সূচিতে মুর্শিদাবাদে যাওয়া এবং ডায়মন্ডহারবারে পিকনিক করা।

(৭) কর্মীদের প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক একাউন্টে (জয়েন্ট) জমা দেওয়া মাসিক ১০০ টাকা প্রদানে উৎসাহ দিতে 'হল' থেকেও সমপরিমাণ টাকা জমা দিয়ে একটা দীর্ঘকালীন (অবসরকাল পর্যন্ত) অর্থ জমানোর প্রক্রিয়া শুরু করা- ইত্যাদির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করা। ইনডোর আউটডোর গেমস-এর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছেলেরা পেয়ে গেল যথাসময়ে।

অত্যন্ত সাড়ম্বরে ও সুচারুভাবে সবার উপস্থিতিতে তিন দিনের কার্যক্রম শেষ হল। অতিথি অভ্যাগতরা সব কার্যক্রমের পর একটা কথাই বলল- 'চমৎকার, সব সুন্দর হয়েছে।' রক্তদান শিবিরে ৭৪ টি ছাত্র-আবাসিক ও আমি (ওদের সুপার) ওদের সাথে রক্তদানে অংশ নিলাম ৭৫ বৎসর বা প্লাটিনাম জুবিলির এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। সব অতিথিবৃন্দ বক্তব্যে যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অজিত পাঁজা এসে ফোন বুথ ও লাইব্রেরী উদ্বোধন করলেন। অ্যানুয়াল এক্সকারসন্ ও পিকনিক ভালোভাবে হয়ে গেল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা ও অন্যান্যরা, 27.01.1993

রামমোহন রায় হলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রেক্টর ডঃ করুণা কেতন সেন , 28.01.1997

প.ব. প্রাক্তন মন্ত্রী এবং প্রাক্তন হল সুপার অধ্যাপক ডঃ শান্তি দাশগুপ্ত পুরস্কার দিচ্ছেন। 04.02.1995

অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রলাল চ্যাটার্জী, সহ-অধ্যক্ষ গোবিন্দ সাহা, গোপালবাবু, দেবুবাবু, ও আরো অনেকের সঙ্গে লেখক। 09.02.1994

বছর শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'জন অডিটর এসে হল-একাউন্টস্ অডিট করে প্রশংসা পত্র দিয়ে গেলেন।

নেতাজীর জন্মদিনে সুপার সহ আবাসিকবৃন্দ,

১৯৯২-'৯৩ আর্থিক বছরেই ৫০ টি দাবীর ১০০% হয়ে গেল। এরপর প্রায় একই গতিতে সুন্দরভাবে পরের বছরগুলো, অর্থাৎ ১৯৯৬-'৯৭ আর্থিক বছর পর্যন্ত হোস্টেলের কার্যক্রম এগিয়ে গেল। তার পরের বছর কিছু ছেলে সময়মতো মেস ও হলের ফিস্ না দেয়ায় সব ছাত্রদের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি পাঠালাম, দেয় অর্থের পরিমাণ জানিয়ে।

আসলে যে দীর্ঘসময় শ্রম দিয়ে, সময় দিয়ে হোস্টেলের অবস্থা সর্বোত্তম করে তুলেছি, নতুন এই ৫/৭ টি আবাসিক তো তা দেখেনি বা জানেওনা। না করা সত্ত্বেও মেসে কর্মীদের ওপর জোর খাটিয়ে খেতে যাওয়ায় আমি দুঃখ পেলাম ও সিদ্ধান্ত নিলাম- এবার ছেড়ে দেব হোস্টেল। তাও শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছি। যেখানে ৯৫% আবাসিকের নানা অসুবিধা ছিল ও বহু ছাত্র উচ্ছৃংখল ছিল, তার থেকে প্রায় সবটাই পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল গুলোর মধ্যে একটা 'আদর্শ হল' তৈরি করতে পেরেছিলাম। কিন্তু ২/৪ জন অবাধ্য ছেলের আচরণে আমি রীতিমত আঘাত পেলাম ও শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সালের মে মাসে হোস্টেল ছেড়ে নিজের বাসস্থানে ফিরে গেলাম।

স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন 1994

প্রথম দিকে প্রায় দু'বছর দিনে ১২/১৪ ঘন্টা খেটেছি। পরের দিকে ৪/৫ ঘন্টা সময়ই যথেষ্ট ছিল। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সহ-সুপার ছিলেন অধ্যাপক নিখিলেন্দু ব্যানার্জী। এরপর আরো একজন কিছুকালের জন্য সুপার হলেন। অত্যন্ত সুনামের সাথে হোস্টেল পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

হস্টেলের ছাত্রদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ 22.11.1992

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সিটি ও আনন্দমোহন কলেজের কর্তৃপক্ষ, কলেজের ছাত্রসংসদ, ব্রাহ্মসমাজ , আমহার্স্ট স্টীট থানা- সব পক্ষ থেকেই হোস্টেল পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। তাছাড়া সমস্ত আবাসিক বৃন্দ, সব কর্মচারীবৃন্দ, সহ-সুপার প্রভৃতির কাছ থেকেও পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ায় কাজের গতি ও

হোস্টেলের দৈনন্দিন কর্মকান্ডগুলো খুব ভালোভাবে হতে পেরেছে। শেষ বছরে যে কজন ছাত্র হল ও মেসের দেয় অর্থ না দিয়ে, জোর করে থেকেছে ও খেয়েছে, তাদের কথা বাদ দিলে খুব আনন্দে কাটিয়েছি। এত কাজ করেও ক্লান্তি মনে করিনি কোনদিন। দ্বিগুন উৎসাহে কাজ করতে পেরেছি। এটা আমার কর্মজীবনের একটা বিরাট সাফল্য। সাত বছরের পুরো রিপোর্টই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জানিয়েছি হোস্টেল ছাড়ার আগে।

আমিও দায়িত্ব ছাড়লাম, তার কয়েকবছরের মধ্যেই এত সুন্দর করে গড়ে তোলা ঐতিহ্যপূর্ণ 'রামমোহন রায় হল' চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সব রকমের সুবিধা যুক্ত কলেজ লাগোয়া এমন একটি চমৎকার হোস্টেল আজ একটি 'পোড়ো বাড়ি' ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম জীবনে সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজ্যের এক প্রাক্তন রাজ্যপাল, স্যার আশুতোষ মুখার্জী প্রভৃতি গুণীজন। সরস্বতী পূজা নিয়ে মতামত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন। সিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন শ্রী সৌমিত্র চ্যাটার্জী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রভৃতি। এমনি কৃতী প্রায় ৪০-৫০ জন ছাত্র বা অধ্যাপক বা বিশিষ্টজনের হোস্টেলে বিভিন্ন সময়ে পদার্পণে হোস্টেল প্রাঙ্গন ধন্য হয়েছিল। তাই হোস্টেলের প্রতি আমার এতটা আগ্রহ ছিল। প্রচুর শ্রম দিয়ে যে হোস্টেলটি গড়ে তুলেছিলাম, তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি দুঃখ পেয়েছি সবচেয়ে বেশি। ১৮৫ জন অনার্সের ছাত্র দূরদূরান্ত থেকে এসে কলকাতার কেন্দ্রে অবস্থিত সব সুবিধাযুক্ত এমন একটি হোস্টেলে থাকার সুযোগ পাওয়া ওদের ভাগ্যের কথা। সেটির দরজা বন্ধ হল কেন, কে জানে? আমার সুপার হয়ে কাজে যোগ দেওয়ার আগের ২০/২৫ বছর নানা অসুবিধার মধ্যে আবাসিকদের কাটাতে হয়েছে। এরপর ওরা পেয়েছে অনেক ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত।

আমরা গড়তে জানি না, গড়া জিনিস রক্ষা করতে পারিনা। শুধুই ভাঙতে জানি, ধ্বংস করতে পারি। কোটি কোটি টাকার এই অট্টালিকা সদৃশ্য ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদ আজ একটি ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে দেখে ব্যথা অনুভব করি। আর শুধুই নীরবে নিভৃতে কাঁদি।।

আংশিক অক্ষরবিন্যাসঃ- ইমতিয়াজ আহমেদ, ষষ্ঠ সেমিস্টার।

বিশ্বাসের জন্ম-মৃত্যু

- তরুণ কুমার তপাদার, প্রাক্তন অধ্যাপক

এক সময় আমাদের বাড়িতে অনেক রকম পুজো-পার্বণের চল ছিল। বহুদিন হ'ল সেসব বন্ধ হয়ে গেছে। শেষদিকে লক্ষ্মী পুজো আর সরস্বতী পুজো এই দুটি মাত্র টিকে ছিল। সেসবও বন্ধ হয়ে গেছে অনেক বছর আগে। ঐ সময় আমরা যারা স্কুলে নিচু ক্লাসে পড়তাম, সরস্বতী পুজোর দিনটা আমাদের খুব আনন্দে কাটত। পুজোর দিন সকালবেলায় আমাদের পড়াশোনা করতে হ'ত না। বই-খাতা সরস্বতী ঠাকুরের সামনে জমা দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত মনে পুজোর আয়োজন দেখতাম। সকাল সকাল চান করার জন্য মা ভোর থেকে তাড়া দিতেন। এদিকে শীতকাল তখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি, তাই সকালবেলা চান করতে একেবারেই ইচ্ছে করত না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চান করে পুজোর সামনে এসে বসতে হ'ত। আমাদের পরিবারে পুজো-শেষে সরস্বতী ঠাকুরকে প্রণাম করার একটা বিশেষ রীতি ছিল। ঠাকুরের মূর্তির সামনে রাখা দোয়াত থেকে খাগের কলম তুলে মেঝেতে সেই কলমের উপর কপাল চেপে ঠাকুর প্রণাম করতে হ'ত আমাদের। অবশ্য এ নিয়ম শুধু আমরা ছোটরাই মানতাম। বড় দাদা দিদি কেউ এসব করতো না। এই কাজে আমাদেরও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। কারণ মা-ঠাকুমারা বলতেন, প্রণাম শেষে যার কপালে কলমটি আটকে থাকবে পরীক্ষায় সে নিশ্চিত ভালো নম্বর পাবে। বেশি নম্বর পাওয়ার আশায় আমরা সকলেই যথাসম্ভব জোরে কপাল চেপে ঠাকুর প্রণাম করতাম। ঠাকুরকে মনে মনে কি যে বলতাম, নাকি কিছুই বলতাম না- এখন সেসব মনে করতে পারিনা। তবে প্রণাম শেষে কলমটি যাতে ভালোভাবে কপালে আটকে থাকে সেই আশায় কলমটির ওপর যে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করতাম সেটা বেশ মনে আছে। ভাইবোনদের সকলেরই এক চিন্তা ছিল। তাই প্রণাম শেষে দেখা যেত সকলের কপালেই খাগের কলম বেশ ভালোভাবে আটকে আছে। ভবিষ্যতে স্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফল হবে ভেবে আমরা সকলেই খুশি হতাম। অথচ পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা যেত সবাই ভালো নম্বর পেয়ে পাস করেনি, দু'একজনের ফল বেশ খারাপ হয়েছে। তখন অবাক হয়ে ভেবেছি খাগের কলম ওদের কপালেও তো অনেকক্ষণ আটকে ছিল, তাহলে এরকম ফল হওয়ার কারণ কি! মনের এই সংশয় যেতে বেশি সময় লাগেনি। খাগের কলম আটকে থাকার সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করার যে কোন যোগসূত্র নেই, এটা বুঝতে পারলেও প্রথাকে অমান্য করার সাহস ছিল না। তাই কয়েক বছর এভাবেই চলেছি। হয়তো নিছক মজার জন্য এটা করতাম। দীর্ঘদিন এরকম হাস্যকর কথা ছোটদের বলার পেছনে কি কারণ ছিল আজও বুঝে উঠতে পারিনি। ব্যাপারটা সহজবোধ্য ছিল বলে এই ভ্রান্ত ধারণা ঘিরে কোন 'বিশ্বাস' গড়ে ওঠেনি কারো মনে। এরকম বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হলে এর প্রভাবে সুস্থ চিন্তা-ভাবনা বিঘ্নিত হয়। একসময় এই ভিত্তিহীন বিশ্বাস আমাদের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্ধবিশ্বাস আর প্রশ্নাতীত আনুগত্যকে আমরা ভক্তি বলে বিবেচনা করি। এর ফল প্রায়শই মঙ্গলজনক হয় না।

অহেতুক বিশ্বাস বা ভক্তি আমাদের স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি কে কিভাবে আচ্ছন্ন করে নিচে লেখা কাহিনী থেকে তার কিছু আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে।

ধর্মগুরু বা তথাকথিত 'বাবা'-দের নিয়ে অনেক রকম কাহিনী প্রচলিত আছে। ভক্তবৃন্দ দাবি করে তাদের গুরুদেব আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল। এ নিয়ে বিতর্ক আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কারণ অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজের জন্য কয়েকজন ধর্মগুরু বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছেন। এঁরা নামিদামি আইনজীবী নিয়োগ করেও শাস্তি এড়াতে পারেননি। কারো আজীবন কারাবাসের শাস্তি হয়েছে, কেউবা শাস্তি ঘোষণার অপেক্ষায় দিন গুনছেন। এ কাহিনীও এক ধর্মগুরু বা 'বাবা'-কে নিয়ে।

একবার এক দম্পতি কোন ধর্ম গুরুর আশ্রমে এসেছে। ভদ্রমহিলা সন্তানসম্ভবা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই ইচ্ছা তাদের যেন পুত্র সন্তান হয়। 'বাবা'-র কাছে এসে তারা নিজেদের মনের কথা জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। 'বাবা' কিছুক্ষন নিঃশব্দে বসে রইলেন, তারপর ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তোর ছেলেই হবে। কোন চিন্তা করিস না।' এরপর ছেলেটিকে বললেন, 'কাল এসে একটা মাদুলি নিয়ে যেও।' পুত্র সন্তানের আশ্বাস পেয়ে দম্পতি খুব খুশি। তারা গুরুদেব কে প্রণাম করে সাধ্যমত প্রণামী দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

পরের দিন সকালে ছেলেটি আশ্রম এল। 'বাবা' ওকে একটা তাবিজ দিয়ে বললেন, 'কাল ভোরে চান করে তোমার স্ত্রী যেন এটি বাঁ-হাতে পরে নেয়। কখনো এটা হাত থেকে খুলবে না। পুত্র সন্তান জন্মানোর পর গঙ্গায় গিয়ে মাদুলিটি কপালে ছুঁয়ে জলে ফেলে দিতে বলবে।' ছেলেটা খুশি হয়ে 'বাবা'-কে আরো একবার যথাসম্ভব প্রণামী দিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, মহিলা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। শিশুটি সুস্থ-সবল, কিন্তু ওদের মনে আনন্দ নেই। কারণ তারা পুত্রসন্তান চেয়েছিল। আর 'বাবা'র দেওয়া মাদুলি পরার পর তারা একরকম নিশ্চিন্ত ছিল যে, তাদের ছেলেই হবে। মেয়ে হওয়াতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব মুষড়ে পড়েছিল। গুরুর প্রতি তাদের এতটাই বিশ্বাস ছিল যে মেয়ে হওয়াটা তারা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না। অবশেষে মনের এই অস্থিরতা দূর করতে একদিন 'বাবা'র আশ্রম এসে হাজির হ'ল, 'বাবা' সব কথা শুনে বললেন, 'মাদুলিটা দাও।' মেয়েটি হাত থেকে মাদুলি খুলে 'বাবা'র হাতে দেওয়ার পর তিনি ওটার মুখ খুলে ভেতর থেকে এক টুকরো পাকানো কাগজ বের করে একবার দেখলেন। তারপর সেটি ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখ।' ছেলেটি দেখল কাগজে লেখা আছে, 'মেয়ে হবে।' কি বলবে বুঝতে না পেরে সে অবাক হয়ে গুরুর দিকে চেয়ে রইল। ওর স্ত্রী ও লেখাটা পড়েছে। তার অবস্থাও একই রকম। ওদের অবস্থা দেখে বাবা বললেন, 'তোরা দুঃখ করিস না। তোদের মেয়ে হবে আমি জানতাম, কিন্তু সে কথা বললে তোরা দুঃখ পেতিস। আমি তা চাইনি। তাছাড়া মায়ের মন ভালো থাকলে সন্তান সুস্থ-সবল

হয়। কিন্তু একদিন তো সত্যিটা প্রকাশ পাবেই, তাই আমি সেটা লিখে মাদুলি তে ভরে রেখেছিলাম।' গুরুর কথায় ওদের সংশয় দূর হ'ল। 'বাবা' যে ওদের মঙ্গলের কথা এতটা ভেবেছেন সেটা বুঝতে পেরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুশি হয়ে 'বাবা'-কে প্রণাম করে গুরুর প্রতি অটুট ভক্তি আর বিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

গুরুভক্তিতে এই দম্পতি এতটাই আচ্ছন্ন ছিল যে তারা একবারও ভেবে দেখল না, যদি পুত্র-সন্তান হ'ত মাদুলির ভেতরের 'মেয়ে হবে' লেখাটা ওদের অজানাই থেকে যেত। 'বাবা'-র নির্দেশমত তাবিজটি জলে ফেলে দিতে হ'ত। ফলে ওরা বিশ্বাস করত 'বাবা'-র দেওয়া মাদুলির প্রভাবেই ওদের পুত্রসন্তান জন্মেছে। 'বাবা'-র অলৌকিক ক্ষমতার উপর ওদের বিশ্বাস অটুট থাকত। গুরুর ছোট্ট কৌশলটা ওরা বুঝতে পারল না। এটা অনেকটা সেই Toss করার খেলা, যেখানে বলা হবে, "Head I win, Tail you lose." এই চাতুর্য বুঝতে না পারার কারণে দম্পতির দৃঢ়বিশ্বাস জন্মালো, 'বাবা' ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

সাধু বাবারা আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন, আর 'বাবা'-রা থাকলে ভক্তবৃন্দেরও অভাব হবে না। ভক্তি থাকাটা কোন অন্যায় বা অপরাধ নয়; কিন্তু বিচার-বিবেচনাহীন বিশ্বাস বা আনুগত্যের কারণে আমরা প্রায়শই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। এই কাজে একটু সতর্ক হলে অনেক বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

Department of Physics

Teaching Staff

Dr. (Smt) Mita Mondal (HOD)	Associate Professor
Dr. (Smt) Samapti Pal	Associate Professor
Dr. Kausik Mukhopadhyay	Assistant Professor
Dr. Somdeb Chakraborty	Assistant Professor
Dr. Anshuman Nandy	Assistant Professor
Dr. Arindam Midya	Assistant Professor
Sri Kalyan Samajpati	Graduate Laboratory Instructor
Smt. Debasmita Samanta	State Aided College Teacher II
Smt. Devdali Banerjee Mitra	State Aided College Teacher II

Non-Teaching Staff

Sri Pradip Kumar Chakraborty	Laboratory attendant
Sri Uchit Das	Laboratory attendant

" An experiment is a question which science poses to Nature, and a measurement is the recording of Nature's answer "